ভূতের গল্প

২৫টি সেরা ভূত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

আয়নার মানুষ 3
ইঁদারায় গন্ডগোল 14
কালাচাঁদের দোকান 25
কালীচরণের ভিটে 32
কৃপণ 38
কোগ্রামের মধু পন্ডিত. 47
কৌটোর ভূত 55
গন্ধটা খুব সন্দেহজনক. 60
গুপ্তধন 72
জকপুরের হাটে. 79
টেলিফোনে 86
ঢেকুর. 93
দুই পালোয়ান 101
দুই ভূত. 106
ধুলোটে কাগজ. 110

নফরগঞ্জের রাস্তা.......................... 118
নয়নচাঁদ.......................... 126
পুরোনো জিনিস.......................... 135
ভূত ও বিজ্ঞান.......................... 142
ভূতের ভবিষ্যৎ.......................... 148
মাঝি.......................... 160
লালটেম.......................... 167
লোকটা.......................... 177
শিবেনবাবু ভালো আছেন তো.......................... 188
শিবেনবাবুর ইস্কুল.......................... 194

আয়নার মানুষ

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড়ো হা-হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনোক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ-কুমড়ো ফলায়। দুঃখেকষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনোক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।

পরানবাবু ভারি ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে ছোটোকাকা ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে পাগলু পরান। তবে পরানবাবু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু।

তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।

আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভালো আছো তো ভায়া!

লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনোদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।

অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশিভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে ল্যাংড়া বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, দ্যাখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।

অবাক কান্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়ালঘরের চালে লাউ কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ-পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে-নেংচে চলতে হয়েছিল।

তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা-চেনা ঠেকছে!

আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না-ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্মকর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।

খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?

আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে। তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।

নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, এঃ, মোটে তিন বিঘে! ছ্যা: ছ্যা:, ও বেচে দাও।

বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?

ভারি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে পরানবাবু বললেন, খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হু:, খাবে!

কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা বলে, তাই ফলে! ভালোয় ভালোয় জমিজমা বেচে দে বাবা।

শুনে ভারি দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কি ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না!

তার বউ ময়না ভারি ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত-উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।

এসব শুনে ভারি ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনো কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারি আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। এই কটা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনও একা আসে না। জমিবেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নীচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাঁটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা-পুলিশ করে কোনো লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুসো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, ভেঙে পড়ার কী আছে! আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু-দিন তো চলুক।

নুন-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে কটা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিষ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।

বাপ-পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?

তবে কি মরবে নাকি?

কাহিল গলায় গদাধর বলল, তাই চলো।

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধের পর দুটি পোঁটলা নিয়ে দুজন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে-না-বেরোতেই প্রচন্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দুজনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোঁপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগবিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলাপুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুটি অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না।

দুজনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, এ কোথায় এলুম!

ময়না বলল, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, আর ভয়টা কীসের?

ময়না বলল, চলো, ফিরে যাই।

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? এ কোন জায়গাটায় এসে পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা গ্রামট্রাম পাওয়া যায় কিনা!

অন্ধকারে ঝোঁপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই-বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর-ডাকাতের উপদ্রব।

একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে। চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কিনা!

সামনে এগিয়ে একখানা মাঠকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারি বিনয়ের গলায় বলল, আমরা বড়ো দুঃখী মানুষ। মশাই, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?

ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।

দুজনে ভারি জড়সড়, ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোনে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোশ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারি নরম সুরে বলল, আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড়ো দুর্দশায় পড়েছি কিনা!

কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু-ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো! তা চাষিবাসিকে তো ঝড়ে-জলে কতই কাজ করতে হয়।

তা বটে, বলে গদাধর হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবখন।

দাওয়ায়! দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।

ময়না ফিসফিস করে বলল, গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!

গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, তাই তো!

ময়না বলল, জিজ্ঞেস করো না!

গদাধর ফের হাত কচলে বলল, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।

ও বাবা, পদধূলি বড়ো কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাতআয়না ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ?

গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাতআয়না ঝুলছে বটে।

আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।

গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।

দুজনেরই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

আয়নার লোকটা বলল, ওরে বাপ, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।

ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে!

বলি ভয়টা কীসের, অ্যাাঁ। এই জন্যই বলে লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, না না, ওর উপর কুপিত হবেন না, আমরা না-হয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।

ভালো। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?

ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামলে নিল। গদাধর বলল, নাঃ, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোমার করছে ময়না?

নাঃ। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!

আয়নার লোকটা বলল, ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।

গদাধর আমতা-আমতা করে বলল, ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।

কথা না-বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা পাটভাঙা ডুরে শাড়ি, দুটো বোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।

কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।

ময়না বলল, হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কিনা।

গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না-দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাই বলুন। ময়নার বড়ো ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।

না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।

কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম বেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারি সংকোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তার লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।

তারপর দুজনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গতকাল ঝড়ে-বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, দুজনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?

তাহলে ব্যাপারটা কী?

তার আমি কী জানি! বাইরে কে যেন কে আছো হে! কে আছো? বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দুটো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল-গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আর এই নাও, এক বছরের হাল-গোরুর ভাড়া আর দুধ বাবদ দাম। সাতশো টাকা আছে।

গদাধর জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে বলল, না না, ছি :-ছি :, এসব আমার পাওনা নয়। আমাকে কেন দিচ্ছেন?

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না-দিলে কি রেহাই আছে হে! ষষ্ঠীপদ ঘাড় মটকাবে। বুঝে নাও ভাই, কাল রাতেই ষষ্ঠীপদ হুকুম দিয়ে গেছে।

আজ্ঞে, ষষ্ঠীপদ কে বটেন?

কেন, পরিচয় হয়নি নাকি? বলি, সে এখন আয়নার মধ্যে ঢুকেছে বলে তো আর গায়েব হয়ে যায়নি। তার দাপটে এখনও সবাই থরহরি কাঁপে। ওই পুবে খালধারের জমিটা তোমার। দশ বিঘে আছে।

কিছুই বুঝতে পারল না গদাধর। লোকটা চলে যাওয়ার পর গোরু আর বলদদের নিয়ে গোয়ালে বেঁধে টাকাগুলো ট্যাঁকে খুঁজে সে গিয়ে আয়নাটা পেড়ে আনল। কিন্তু দিনমানে আয়নায় আর সেই সুড়ঙ্গে মুখখানা দেখা গেল না। নিজের বোকা-বোকা হতভম্ব মুখখানাই দেখতে পেল সে।

এরপর আর একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির সঙ্গে মুটের মাথায় দুটো ভরা বস্তা।

এই যে ভায়া, আমি হচ্ছি শ্যামাপদ মুদি। দু-বস্তা চাল দিয়ে গেলুম। ষষ্ঠীপদর হুকুম তো, আর অমান্যি করতে পারি না। এই দু-বস্তাই পাওনা ছিল তোমাদের। আর এই হাজারটা টাকা।

গদাধর কথা কইতে পারছে না। কেবল ঢোক গিলছে। জিভ, টাগরা সব শুকনো।

একটু বেলার দিকে একজন বউমানুষ এসে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ময়নার কাছে হাজির। একটা পোঁটলা খুলে কিছু সোনার গয়না বের করে বলল, নাও বাবু। তোমার জিনিস বুঝে নাও। মোট আটগাছা সোনার চুড়ি, বাঁধানো নোয়া, বিছেহার, এক জোড়া বালা আর ঝুমকো দুল।

ময়না অবাক হয়ে বলল, এসব আমার হবে কেন?

তা জানি না, ষষ্ঠীপদ গচ্ছিত রেখেছিল। এখন হুকুম হয়েছে, তাই দিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি তো ষষ্ঠীপদবাবুকে চিনিই না।

চিনবে বাপু, এ গাঁয়ে থাকলে তাকে না-চিনে উপায় আছে? তা তোমাদের কপাল ভালো যে, তার নেকনজরে পড়েছ। তার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি কিনা!

সারাদিনে আরও অনেকে এসে অনেক জিনিস দিয়ে গেল। কেউ দা আর কুড়ুল, কেউ শীতলপাটি, কেউ কুয়োর বালতি আর কাঁটা, কেউ কাঠের টুল, কেউ বাসনকোসন বা কড়াই আর হাতা, এমনকী একগাছ ঝাঁটা অবধি। সবই নাকি ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত রাখা জিনিস।

গদাধর আর ময়নার দিশেহারা অবস্থা। গরিব হলেও তারা লোভী লোক নয়। এসব জিনিস তাদের ঘরে ছিল না। তার ওপর ষষ্ঠীপদর রহস্যটাও তাদের মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

খুব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই দিনটা কাটল তাদের। সন্ধে হতেই হঠাৎ সেই বাজখাঁই গলা, সব জিনিস ফেরত দিয়ে গেছে তো?

গদাধর তাড়াতাড়ি আয়নাটা পেড়ে দেখল, সেই সুড়ঙ্গে মুখ। কাঁপা গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে বলুন তো মশাই? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকটা ধমক দিয়ে বলল, বেশি বুঝবার দরকার কী তোমার? কাল থেকে তেঁতুলতলার জমিতে হাল দিতে শুরু করো।

আমরা কি তবে এখানেই থাকব?

তবে যাবে কোন চুলোয়?

ময়না পিছন থেকে ফিসফিস করে বলল, ওগো, রাজি হয়ে যাও। গদাধর গদগদ হয়ে বলল, যে আজ্ঞে!

ইঁদারায় গন্ডগোল

গাঁয়ে একটামাত্র ভালো জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সে-জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কী আর খেত! ছোটো ছোটো পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কী গালে হাপিস করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গন্ডগোল। কোনো দাঁতের সঙ্গে কোনো দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গন্ডগোলের মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেল সে-বার। পেরেক মুখে নিয়ে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কী! পেটের মধ্যে আট-দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে পেটে ব্যথা, মুখে গ্যাঁজলা। ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালি লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, পুরোনো ইঁদারার জল খাওয়াও।

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরও বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই দারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা বড়ো মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সবসময়ে যে হেঁড়ে, তাও নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয়, ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, ভায়ারা, দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুলু কান্ড হয়েছে। দেখেছ কখনো ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারো খেয়ে কাজ নেই।

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড়ো ভালো মানুষ। ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন।

গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফরসা নাদুসনুদুস চেহারা। নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, আজ্ঞে গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তাঁর ধারেকাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজোছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গোরু-বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গোরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সব চেয়ে ভালো গোরু। দু-বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গোরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুহুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, কী চায় ওরা?

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সবসময়ে আস্ত একটা হত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হস্তুকিটা নেই। বুঝতে

পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোক গেলার সময়ে গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হস্তুকিটা পেটে হজম হবে কি না কে জানে! একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরোনো ইঁদারার এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন ভোজনের নেমন্তন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু-বালতি মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা ভাজা সোনা মুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধে ফলারের নেমন্তন্নে দুটো আস্ত প্রমাণ সাইজের কাঁঠাল, এক অন্নপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদার মশাইয়ের সেজোছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু-হাঁড়ি দই আর দু-সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের মধ্যে চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়াদাওয়ার পিছনে আছে পুরোনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হস্তুকি গিলে ফেলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হতুকি এমনিতে বড়ো ভালো জিনিস। কিন্তু আস্ত হর্তুকি পেটে গেলে হজম হবে কিনা, সেইটেই প্রশ্ন। পুরোনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরোনো ইঁদারার জল বড়ো বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ-বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড়ো গোরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তা ছাড়া ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো-দান মহাপুণ্যকর্ম।

রায়মশায়ের নতুন সভাপন্ডিত কেশব ভট্টাচার্যও মাথা নেড়ে বললেন, কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার আমার অগ্নিমান্দ্যের সময় গোবিন্দপুর থেকে পুরোনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?

চক্কোত্তিমশাই ট্যাঁক থেকে আর একটা হতুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, আজ্ঞে না। তাতে এখনও কাকচক্ষু জল টলটল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা-ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, কার এত সাহস?

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়েচড়ে বসল। মাথার ওপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা!

ঠাকুরমশাই বললেন, আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারও নেই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না-চেনে! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না-কুলোলে আপনি শাসন করবেন। কিন্তু একাজ যাঁরা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, ওরে, বলিস না, বলিস না!

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, মুখ সামলে কথা বলো।

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হস্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতিকষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড়ো ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না, শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, কী যেন বলছিলি?

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, আজ্ঞে সে-এক অশরীরী কান্ড। ভূ-

বলিস না! খবরদার বলছি, বলবি না! রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ-ওর মুখে চাওয়াচায়ি করে। নায়েবমশাই চোপ বলে একটা প্রকান্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আবার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, ইঁদারার জলে কী যেন?

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, আজ্ঞে সে-এক সাংঘাতিক ভূতুড়ে ব্যাপার!

চুপ করো, চুপ করো! রাম রাম রাম রাম! বলে আবার রায়বাবুর কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে বলেন, রেখে ঢেকে বলো।

আজ্ঞে বালতি-ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত হেঁড়েন। তা ছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে ফাঁপে।

বাবারে! বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।

যে আজ্ঞে।

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, হুজুর, আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের দারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।

দারা বুজিয়ে ফেলগে। ও দারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি দারা বোজানোর জন্য গো-গাড়ি করে ভালো মাটি পাঠিয়ে দেবখন।

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়। কাছারিঘরের সব প্রজাই হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরি। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত–।

রায়বাবু হুংকার দিলেন, চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়, একবার যাবেন নাকি সেখানে?

রায়মশাইয়ের আগের সভাপন্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশো বছর পার করে এখনও বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারি ভুলো মন আর দিনরাত খাই-খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপন্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা বা পান্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বলতা সেও বেশি কথা কিছু নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো-গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ-দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার লোক।

ভারি সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুলগাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড়ো বড়ো ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে হাঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুতু ফেলব।

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুল পড়ে গেল। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ দিয়ে জল একেবারে হাঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কান্ড দেখে দে-দৌড় পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

থুতু ফেলবেন না, থুতু ফেলবেন না। বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়-ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সব কটার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, ঢুকেছিলি কেন এখানে?

আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড়ই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগবালাই নেই। একশো-দেড়শো বছর হেসে-খেলে বাঁচে! নামলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি।

বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।

কেশব বললেন, অতিকূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স এক-শো বিশ বছর। বিশ্বাস না-হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?

একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ করে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা-আমতা করে বলেন, ঠিক স্মরণ নেই।

কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারি কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, ভূতেরা কি মরে?

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, সেটাও কূট প্রশ্ন।

চক্কোত্তি সঙ্গেসঙ্গে বললেন, কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না-ই মরে, তবে সেটাও ভালো দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না- তাহলে মরব কীসে! দোষটা কি আমাদের?

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, তাহলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবা- সকল।

কেশব বললেন, অতিকূট প্রশ্ন।

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।

শ-পাঁচেক ছন্নছাড়া, বিদঘুঁটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব!

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে উঠে বলল, ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিনরাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তা-ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে-কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।

এও অতিকূট প্রশ্ন। কেশব বললেন।

চক্কোত্তিমশাই এবার আর আপাতগ্রাহ্য বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, তাহলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না-যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুতু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার! এক্ষুনি আমি সব ভূত বাবা-সকলের গায়েই থুতু ফেলছি।

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুতুকে ভূতদের ভারি ভয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, থুতু ফেলবেন না! থুতু দেবেন না!

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতেদের দিকে ফিরে বললেন, চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনও মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেকে না।

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে, আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি।

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, তা হয় না। ঘটি-বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দুজনে মিলে থু–

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারার লাফিয়ে নেমে ঠনঠন ঘটি-বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি-বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে।

পুরোনো ইঁদারায় এরপর আর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক-দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরও চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

কালাচাঁদের দোকান

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পপাস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ-স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?

গিন্নি বললেন, ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরপর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।

বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছোলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুরগাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?

নবীনবাবু বললেন, বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু-দিন হাট।

তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?

ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে!

জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না-করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কী আর করা! নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে।

প্রথমদিন বাজার করতে দু-ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারীদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়া যায় না সব কিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!

নবীনবাবু ফাঁপরে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?

দেখো না একটু খুঁজেপেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটোখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডানহাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপানা কণ্ঠধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, আজ্ঞে আসুন।

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, আছে। ভালো ঘানির তেল।

কত দাম?

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ-টাকা করেই দেবেন।

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু-ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, বা, এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?

নবীনবাবু বললেন, আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড়ো ভালো।

লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু-দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, আপনাকে দাম দিতে হবে না।

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নামই তো জানি না এখনও।

আজ্ঞে কালাচাঁদ নন্দী। কালো বলেই ডাকবেন।

আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?

যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও-সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, ওগো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলে মেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমনো করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরমমশলা।

দাম?

দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ে তো! দরকারমতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁগো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাসবাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায় কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, সাতজন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।

হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলবখন।

দু-দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরোনো?

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, তা কম হবে না। ধরুন, এ-গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরোনোই হবে তাহলে দাস-গিন্নি এ-দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, এ-গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।

আচ্ছা, তাই হবে।

পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, হ্যাঁগা, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে

পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়োন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু একথা-সেকথার পর কালাচাঁদকে বললেন, তা। কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।

ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ-দোকানের কথা জানে না।

কালাচাঁদ তেমনই মৃদুমৃদু হেসে বলে, জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো খদ্দের কখনো দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, একজনের জন্যই তো দোকান।

অ্যাঁ!

কালাচাঁদ হাসল, আসবেন।

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়?

পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।

তাড়া কীসের?

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু-দিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকাপয়সার কথা থাক।

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন! পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারী জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাকসবজিও ক্রমে-ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছমাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকেরও ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, ওগো, নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।

দিয়ো না। হ্যাঁগো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, না, না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কী সব সয়?

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

কালীচরণের ভিটে

কালীচরণ লোকটা একটু খ্যাপা গোছের। কখন যে কী করে বসবে, তার কোনো ঠিক নেই। কখনো সে জাহাজ কিনতে ছোটে, কখনো আদার ব্যবসায় নেমে পড়ে। আবার আদার ব্যাবসা ছেড়ে কাঁচকলার কারবারে নেমে পড়তেও তার দ্বিধা হয় না। লোকে বলে, কালীচরণের মাথায় ভূত আছে। সেকথা অবশ্য তার বউও বলে। রাত তিনটের সময় যদি কালীচরণের পোলাও খাওয়ার ইচ্ছে হয় তো, তা সে খাবেই।

তা, সেই কালীচরণের একবার বাই চাপল। শহরের ধুলো-ধোঁয়া ছেড়ে দেশের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে বসবাস করবে। শহরের পরিবেশ ক্রমে দূষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোজ খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, জণ্ডিস, যক্ষ্মা–শহরে কী নেই?

কিন্তু কালীচরণের এই দেশে গিয়ে বসবাসের প্রস্তাবে সবাই শিউরে উঠল। কারণ, যে গ্রামে কালীচরণের আদি পুরুষরা বাস করত, তা একরকম হেজেমজে গেছে। দু-চারঘর নাচার চাষাভুষো বাস করে। কালীচরণদের বাড়ি বলতে যা ছিল, তাও ভেঙেচুরে জঙ্গলে ঢেকে ধীরে-ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেই বাড়িতে গত পঞ্চাশ বছর কেউ বাস করেনি, সাপখোপ, ইঁদুর-দুচো, চামচিকে, প্যাঁচা ছাড়া।

কিন্তু কালীচরণের গোঁ সাংঘাতিক। সে যাবেই।

তার বউ বলল, থাকতে হয় তুমি একা থাক গে। আমরা যাব না।

বড়ো ছেলে মাথা নেড়ে বলল, গ্রাম! ও বাবা, গ্রাম খুব বিশ্রি জায়গা।

মেয়েও চোখ বড়ো বড়ো করে বলে গ্রামে কি মানুষ থাকে?

ছোটো ছেলে আর মেয়েও রাজি হল না।

রেগেমেগে কালীচরণ একাই তার স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বলে গেল, আজ থেকে আমি তোমাদের পরস্য পর। আর ফিরছি না।

কালীচরণ যখন গাঁয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরবেলা। গ্রীষ্মকাল। স্টেশন থেকে রোদ মাথায় করে মাইলটাক হেঁটে সে গ্রামের চৌহদ্দিতে পৌঁছে গেল। লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

গোঁয়ার কালীচরণ নিজের ভিটের অবস্থা দেখে বুঝল যে, এ ভিটেয় আপাতত বাস করা অসম্ভব। চারদিকে নিচ্ছিদ্র জঙ্গলে বাড়িটা ঘেরা। আর বাড়ি বলতেও বিশেষ কিছু আর খাড়া নেই। তবু হার মানলে তো আর চলবে না।

একটা জিনিস এখনো বেশ ভালোই আছে। সেটা হল তাদের বাড়ির পুকুরটা। জল বেশ পরিষ্কার টলটলে, বাঁধানো ঘাট ভেঙে গেলেও ব্যবহার করা চলে। কালীচরণ পুকুরে নেমে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে নিল, ঘাড়ে মাথায় জল চাপড়াল। পুকুরের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে একডেলা গুঁড় দিয়ে খেলো। তারপর পুকুরপাড়ে কদমগাছের তলায় বসল জিরোতে।

একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পাখির ডাকে চটকা ভেঙে চাইতেই সে সোজা হয়ে বসল। তাই তো! চারদিক জঙ্গলে ঢাকা হলেও উত্তরের দিকটায় জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি পথ আছে যেন! মনে হয় লোকজনের যাতায়াত আছে। তাদের বাগানে অনেক ফলগাছ ছিল। হয়তো এখনো সেসব গাছে ফল ধরে, আর রাখাল ছেলেটেলে সেইসব ফল পাড়তে ভেতরে যায়। তাই ওই পথ।

কালীচরণ বাক্স হাতে উঠে পড়ল। তারপর কোলকুঁজো হয়ে বহুকালের পরিত্যক্ত ভিটের মধ্যে গুঁড়ি মেরে সেঁধোতে লাগল।

ভেতরে এসে স্তূপাকার ইট আর ভগ্নস্তূপের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কালীচরণ। তারপর হাঁ করে দেখতে লাগল চারদিকে।

অবস্থা যাকে বলে গুরুচরণ। একখানা ঘরও আস্ত আছে মনে হচ্ছিল না। এর মধ্যে কোথায় যে রাত্রিবাস করবে সেইটেই হল কথা। কালীচরণের সঙ্গে টর্চ, হ্যারিকেন, লাঠি আছে। ছোটো একটা বিছানাও এনেছে সে। রাতটা কাটিয়ে কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিলে দিন-সাতেকের মধ্যে জঙ্গল আর আবর্জনা সাফ হয়ে যাবে। রাজমিস্ত্রি ডেকে একটু-আধটু মেরামত করাবে। ভালোই হবে।

কালীচরণ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দক্ষিণদিকে নীচের তলায় একখানা ঘর এখনও আস্ত আছে বলেই মনে হল কালীচরণের। পাকার ইট আর আবর্জনার ওপর সাবধানে পা ফেলে কালীচরণ এগিয়ে গেল।

বেজায় ধুলো, চামচিকের নাদি, আগাছা সত্ত্বেও ঘরখানা আস্ত ঘরই বটে। মাথার ওপর ছাদ আছে, চারদিকে দেয়াল আছে। জানলা কপাট অবশ্য নেই। একটু সাফসুতরো করে নিলেই থাকা যায়। দরকার একখানা ঝাঁটার।

তা ঝাটাও পাওয়া গেল না খুঁজতেই। ঘরের কোণের দিকে পুরোনো একগাছা ঝাঁটা দাঁড় করানো। পাশে একটা কোদাল। তাও বেশ পুরোনো। বোধহয় সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার।

কালীচরণ ঘণ্টাখানেকের মেহনতেই ঘরখানা বেশ সাফ করে ফেলল। গা তেমন ঘামলও না। তারপর ঘরখানার ছিরি দেখে মনে হল, এক বালতি জল হলে হত। কিন্তু বালতি?

না, কপালটা ভালোই বলতে হবে। ঘর থেকে বেরোতেই ভাঙা সিঁড়ির নীচে চোখ পড়ল তার দু খানা জংধরা বালতি উপুড় করা রয়েছে। কালীচরণ যেমন অবাক, তেমনি খুশি হল–যখন দেখল, একটা বালতিতে লম্বা দড়ি লাগানো রয়েছে।

উঠোনের পাতকুয়োটা হেজেমজে যাওয়ার কথা এতদিনে। কিন্তু কপালটা ভালোই কালীচরণের। মজেনি। সে জল তুলে এনে ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করল। তারপর ভাবল, একটা চৌকিটৌকি যদি পাওয়া যেত তা তোফা হত। আর একটা জলের কলসি।

বলতে নেই, কালীচরণের মনে যা আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে আজ। কলসি পাওয়া গেল পাশের ঘরটায়। মুখটা সরা দিয়ে ভালো করে ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা এখনো পরিষ্কার। একটু মেজে নিলেই হবে। আর চৌকি নয়, খাটই পাওয়া গেল কোণের দিককার ঘরে। ভাঙা নয় আস্ত খাট। কালীচরণ খাটখানা খুলে আলাদা-আলাদা অংশ বয়ে নিয়ে এসে পেতে ফেলল।

চমৎকার ব্যবস্থা।

সন্ধে হয়ে আসতেই কালীচরণ হ্যারিকেন জ্বেলে ফেলল। চিঁড়ে খেয়েই রাতটা কাটাবে ভেবেছিল। কিন্তু সন্ধে হতেই প্রাণটা ভাতের জন্য আঁকুপাঁকু করছে। চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, সব সঙ্গে আছে। কিন্তু উনুন, কয়লা, কাঠ এসব জুটবে কোত্থেকে?

ভাবতে ভাবতে কালীচরণ উঠল। সবই যখন জুটেছে, তখন এও বা জুটবে না কেন?

বাস্তবিকই তাই, ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায় যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানে এখনও উনুন অক্ষত রয়েছে। ঘরের কোণে কিছু কাঠ, মণ দুয়েক কয়লা পড়ে আছে। আর আশ্চর্য, রান্নাঘরে যে বড়ো কাঠের বাক্স ছিল সেটা তো আছেই, তার মধ্যে কিছু বাসনকোসনও রয়ে গেছে।

কালীচরণ দাঁত বের করে হাসল। তারপর গুনগুন গরে রামপ্রসাদী গাইতে-গাইতে রান্না চড়িয়ে দিল। গরম-গরম ডাল-ভাত আর আলুসেদ্ধ ভরপেট খেয়ে ঘুমে রাত কাবার করে দিল কালীচরণ।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই তার মনে হল, বাড়িটা যেন ততটা ভাঙা আর নোংরা লাগছে না। ধ্বংসস্তূপটা যেন খানিক কমে গেছে, নাকি তার চোখের ভুল?

যাই হোক, কালীচরণ কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভাবল, নিজেই করে ফেলবে, লোক লাগানোর দরকার নেই।

দুপুরবেলা কালীচরণ পুরোনো বাগান খুঁজে কিছু উচ্ছে, কাঁকরোল, ঝিঙে, পটল আর কুমড়ো পেয়ে গেল। দিব্যি ফলে আছে গাছে। পাকা আমও রয়েছে। সুতরাং দুপুরে কালীচরণ প্রায় ভোজ খেয়ে উঠল আজ। তারপর ঘুম।

বিকেলে চারদিক ঘুরে দেখে সে খুশিই হল। অনেকটা জঙ্গল সে নিজে সাফ করে ফেলেছিল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আরও অনেক বেশি আপনা থেকেই সাফ হয়ে গেছে। আবর্জনার স্তূপ প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের কথা, বাড়িতে আরও কয়েকটা আস্ত ঘর খুঁজে পাওয়া গেল। সেসব ঘরের জানলা দরজাটাও অটুট। সুতরাং কালীচরণ খুব খুশি। এইরকমই চাই।

তবে সবটা এইরকমই আপনা-আপনি হয়ে উঠলে ভারি লজ্জার কথা। তাই পরদিন কালীচরণ বাজার থেকে গোরুর গাড়িতে করে কিছু চুন-সুরকি, ইট আর কাঠ নিয়ে এল। যন্ত্রপাতি বাড়িতেই পেয়ে গেছে সে, টুকটুক করে বাড়িটা সারাতে শুরু করল।

মজা হল, বেশি কিছু তাকে করতে হল না। সে যদি খানিকটা দেয়াল গাঁথে আরও খানিকটা আপনি গাঁথা হয়ে যায়। সে এক দেয়ালের কলি ফেরালে, আরও চারটে দেয়ালের কলি আপনা থেকেই ফেরানো হয়ে যায়।

সুতরাং দেখ-না-দেখ কালীচরণের আদি ভিটের ওপর বাগানওয়ালা পুরোনো বাড়িটা আবার দিব্যি হেসে উঠল। যে দেখে, সে-ই অবাক হয়।

কিন্তু মুশকিল হল, এত বড়ো বাড়িতে কালীচরণ একা। সারাদিন কথা বলার লোক নেই।

কালীচরণ তাই গ্রাম থেকে গরিব বুড়ো একজন মানুষকে চাকর রাখল। বাগান দেখবে, জল তুলবে, কাপড় কাঁচবে, রান্না করবে। কালীচরণও কথা কইতে পেয়ে বাঁচবে।

লোকটা দিন দুই পর একদিন রাতে ভয় পেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করতে লাগল। সে নাকি ভূত দেখেছে।

কালীচরণ খুব হাসল কান্ড দেখে। বলল, দূর বোকা, কোথায় ভূত?

কিন্তু লোকটা পরদিন সকালেই বিদেয় হয়ে গেল। বলল, সারাদিন জল খেয়ে থাকলেও এ বাড়িতে আর নয়।

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র। কিছুদিন আবার একা। কিন্তু কাঁহাতক ভালো লাগে। অগত্যা কালীচরণ একদিন শহরে গিয়ে নিজের বউকে বলল, একবার চলো দেখে আসবে। সে বাড়ি দেখলে তোমার আর আসতে ইচ্ছে হবে না।

কালীচরণের বউয়ের কৌতূহল হল। বলল, ঠিক আছে চলো। একবার নিজের চোখে দেখে আসি কোন তাজমহল বানিয়েছ।

গাঁয়ে এসে বাড়ির শ্রীছাঁদ দেখে কিন্তু বউ ভারি খুশি। ছেলেমেয়েদেরও আনন্দ ধরে না।

কিন্তু পয়লা রাত্তিরেই বিপত্তি বাধল। রাত বারোটায় বড়ো মেয়ে ভূত দেখে চেঁচাল। রাত একটায় ছোটো মেয়ে ভূতের দেখা পেয়ে মূর্ছা গেল। রাতদুটোয় দুই ছেলে কেঁদে উঠল ভূত দেখে। রাত তিনটেয় কালীচরণের বউয়ের দাঁতকপাটি লাগল ভূত দেখে।

পরদিন সকালেই সব ফরসা। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে শহরে রওনা হওয়ার আগে বউ চলে গেল, আর কখনো এ বাড়ির ছায়া মাড়াচ্ছি না।

কালীচরণ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আপনমনে বলল, কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়ে ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চন্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতো এত ছেঁড়া আর তাপ্পি মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণচুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পরা যায় তাহলে ছাতাই বা পরা যাবে না কেন? সুতরাং, ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটোখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলে-মেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ ছেলে-মেয়েরাও করে নেয়।

ছোটো ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে

তার মধ্যে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় কেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রক-এ উঠে ঝুল বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পেছনে প্রকান্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতন লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলে বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করলেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সবসময়ে কি রসিকতা করতে হয়?

ভেতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনো ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেবে করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালঘড়ির...ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ শ্যামবাবু, এই ভেঁড়া-তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?

কদম্ববাবুর শুধু হতভম্বের মতো বললেন, জাপানি ছাতা?

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক-টা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপসপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালি সুতোর কাজ করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যা তারা যে করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকী তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল।

কদম্ববাবু একথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না। যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ আজ বোধ হয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন, শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়োলোকদেরও কি আর মাঝে-মাঝে গরিব সাজাতে ইচ্ছে যায় না। নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি-মারা জামা, পরনে হেঁটে ধুতি হয় কী করে?

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কি শ্রী! দু-ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নীচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড়ো একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তা শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু-ধারে সারিসারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক- একটা ঝড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে...

না: কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখান ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেই তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলার উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রুপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রূপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোর বাঁধানো বড়ো বড়ো ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হল কী শ্যামবাবুর অ্যা। এ বাড়ি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন। আসুন তাড়াতাড়ি।

সোনামহল্লা কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপো মহলেই যে লাখো-লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পরদা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে-কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকী পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওয়ালা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তাই-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝে একটা বিরাট সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরামকেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোরও আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটি খোপে আবার হিরে, মুক্তো, চুনী আর পান্না বসানো। একধারে সোনার খুঁটি, অন্যধারে রুপোর।

প্রত্যেকটি খুঁটির মাথায় আমার এক কুচি করে হিরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড়ো হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন।

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না। কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ-হাঁ করে উঠল।

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ?

শুধু কী তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হিরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামলে দিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন, এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাঁচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকাপয়সা হিরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম। কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা খুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কান্ড! আমি যে মাত।

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে, কদম্ববাবুর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখ বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেয়ালগিরি? কোথা আসবাবপত্র? এ যে ঘরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ি রমধ্যে বসে আছেন তিনি। চারদিকে নুন-বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল। ইঁদুর দৌড়োচ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝেয় পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

কদম্ববাবু পড়ি কি মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছোলেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবতে লাগলেন সত্যিই তো টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন নতুন একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি ও ছেলে-মেয়েদের জন্য জামাকাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

কোগ্রামের মধু পন্ডিত

বিপদে পড়লে লোকে বলে, ত্রাহি মধুসূদন।

তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পন্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমন বামনাই তেজ, তেমনই সর্ববিদ্যাবিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ-উচাটন জানতেন, তাঁর আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগি বগলাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেছেন। গিয়ে দেখেন, গোটা চারেক মুশকো চেহারার গোঁফওয়ালা লোক উঠোনে হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে আর মধু গিন্নি তাদের পরিবেশন করছে, লোকগুলির চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় চারটে কাঁটাওয়ালা মুগুর রাখা।

মধু পন্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেকদূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুনি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। মধু পন্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি-সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভালো, কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

মধু পন্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এক্ষুনি। ওই চারজন বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবে খন। শচীনখুড়োকে নিতে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন-তখন অবস্থা! এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যই তো নিতে এসেছিল।

বগলাবাবু ভালো বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলিও খাওয়া ছেড়ে উঠল।

মধু পন্ডিত হুকুম করল, এই তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলি পেন্নাম ঠুকে বলল আজ্ঞে যমরাজের দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে, তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যম মশাইকেও কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু মধু পন্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে বগলাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু মধু পন্ডিতের খ্যাতি আরও বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্না-রাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক, বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি। ডাকাবুকো লোক। লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকোতে-চুলকোতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে বললে, আপনারা কী অশরীরী কান্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতেরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোষায় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়। মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা-

ভূতেরা আসে। তা মশাই, এই কোগ্রামে আমরা মোট হাজারখানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু দেড়শো বছর ধরে একটাও নতুন ভুত আসেনি। ওদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানীং তো একেবারে জন্মের মড়ক লেগেছে আজ্ঞে। গত মাসখানেকের মধ্যে এক চোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কি সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয় ছিলাম বড়ো আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি। তা, মধু পন্ডিতের ওষুধ না খেলেই কি নয়?

ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু কদিন পরেই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলছে। তাতে স্লোগান উঠছে, মধু পন্ডিত নিপাত যাক! নিপাত যাক! নিপাত যাক! এ তরুস্তি ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। এ ইলাজি ঝুটা হ্যায়। ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না! মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সিঁড়িঙ্গে ভূতটা খুব কাঁচুমাচু হয়ে মধু পন্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধেবেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কী হে, শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছ তোমরা?

পেন্নাম হই পন্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে আমি আর সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালোই, চরে বরে খা গে। এখন তো তোর একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিভ কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এ-প্রাণে আর জল নেই। বড্ড ভয়-ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারছি না, শুতে পারছি না। রাতে শেয়াল ডাকে প্যাঁচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা, তোর ভয়টা কীসের?

আজ্ঞে একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজার পেয়াদাগুলিও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ড্যাঙস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সিঁড়িঙ্গে ভূতটা মধু পন্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জানো?

বেশি বলে তো মনে হয় না। কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানম্বই, বুঝলে? পঁচানব্বই। আমার কাকা কদম্বকেশরের বয়স জানো?

খুব বেশি আর কী হবে?

তোমার কাছে বেশি না লাগলেও, বেশি-ই। একশো পঁচিশ বছর।

তা হবে।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অন্তত জানো?

মধু পন্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি, উনি গেলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা।

জানো তাহলে? বাঁচালে। এও নিশ্চয়ই জানো, কাকার সম্পত্তি পাব এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি। জানো, একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভালো করে লেখাপড়া করিনি পর্যন্ত। একদিন জমিদারনি হবে এই আশায় আমার গিন্নি এই বুড়ো বয়সেও যে বাড়িতে ঝি-এর অধম খাটে, তা জানো! আমার বড়ো ছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে! শোনো বাপু, কাকা মরুক এ আমি চাই না। কিন্তু হকের মরাই বা লোকে মরছে না কেন? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু মরছে কোথায়! আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তো যেতে পারে। বৈরাগী হয়ে পথে-পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে। তা তোমার ওষুধে কি সে সবেও বারণ নাকি? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না, সেইটেই বুঝি না।

মধু পন্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ-সবল থাকে, মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে, তবে আপনি একশো বছরেও যুবক। উলটো হলে, পঁচিশ বছরেও বুড়ো এই আপনার কাকাকেই দেখুন না। মোটে তো সোয়া শো বছর বয়স, দেড়শো পেরিয়েও দিব্যি হাঁকডাক করে বেঁচে থাকবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ?

নির্যস সত্যি কথা।

কুন্দকেশর চলে গেলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি নিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড়ো ছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সন্ধে হয়ে এসেছে, প্রচন্ড বর্ষা নেমেছে আজ। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের হাওয়া বইছে। এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পন্ডিতের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক। ইয়া গোঁফ, ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি। তাতে ময়ূরের পালক, গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবু লোকটি ভারি সুপুরুষ।

মধু পন্ডিত হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি তোমার যম। জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল।

শুনে মধু পন্ডিত একটু চমকে উঠল। খুন করবে নাকি? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে। কাঁপা গলায় মধু বলল, আজ্ঞে।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেও না বাপু। আমি ভয় দেখাতে আসিনি।

বরং বড়ো ভাইয়ের মতো পরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না। আমি যে সত্যিই যমরাজা, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। মধু দন্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল, তা ঠিক মনে পড়ছে না।

বলো কী? যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে?

আজ্ঞে অনেক দিনের কথা তো, দাঁড়ান, গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলে মধু পন্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে, এই বর্ধমানের গোবিন্দপুর। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি গত হয়েছেন।

যমরাজ বলেন, তা শালা-শালিরা তো আছে।

ছিল, এখন আর নেই।

তাদের ছেলে-মেয়েরা সব?

আজ্ঞে তারাও গত হয়েছে। তস্য পুত্র-পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজ ডাকলেন, চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দেখো তো।

রোগা সিঁড়িঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দুশো পঁচিশ।

ছি :-ছি : মধু! যমরাজ অভিমানভরে বললেন, এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে, আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙে চলছ, চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন, মধু কিছুদিনের মধ্যেই মজা টের পেতে লাগল।

হয়েছে কী, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায়, তা নয়। রোদে শুকোতে দিলে পাখি-পক্ষীও খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে, ধেড়ে ইঁদুরও ভাগ বসায়। তাদেরও হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা-মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন-দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট বাড়তে লাগল। আরও মুশকিল হল জীবাণুদের নিয়ে। কলেরা রুগিকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রুগিও মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিক রুগিরও সেই দশা, কোগ্রামে ঘরে-ঘরে

রুগি দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা-হাঁটা চলা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজ এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে, লোকে বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

তা তো একটু পাবেই। এখনও বলো, যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কিনা।

শশব্যস্ত দন্ডবৎ হয়ে মধু পন্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি, তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশো বছর বয়সের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে, তোমার এত প্রিয় গাঁ, তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছ থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতবরি করতে কখনো যেও না। আমি গন্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারায় থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দন্ডবৎ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে!

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম, তা খুঁজে-খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

কৌটোর ভূত

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন, তখনই আমরা হঠাৎ ছোটোরা ভারি খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ আগের পূর্ববঙ্গের গাঁ-গঞ্জ ছিল আলাদা রকম মাঠ-ঘাট, খালবিল, বনজঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপখোপ, জন্তুজানোয়ার তো ছিলই, ভূতপ্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন, মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষেরা বেশির ভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদু-টাদু গোছের বয়স্করা। বাবা-কাকা-দাদাদের সঙ্গে বলতে কী আমাদের ভালো পরিচয়ই ছিল না, তাঁরা প্রবাসে থাকার দরুন।

বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হই-হুল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম! তখন পড়াশুনোর চাপ ছিল। ভয়াবহ কোনো শাসন ছিল না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন। আত্মীয় নন, মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েক দিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন। যে-কয়েকটা দিন থাকতেন, বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক, গায়ের রং কালো, বেঁটে, আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তাঁর। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড়ো বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম, তাঁর ফলাও কারবার। তিনি নাকি সব কিছু কেনেন এবং বেচেন। যা পান তাই কেনেন, যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনো বাছাবাছি নেই।

সেবার মাঘ মাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। হয়েই দাদুকে বললেন, গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, খুব ভালো। এবার বেচে দাও।

জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, সেটাই তো সমস্যা! ভূত কেনে কে? খদ্দের দিন না।

খদ্দর? না বাপুসব আমি পরি না। স্বদেশিদের কাছে যাও।

আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গাহেক।

গায়ক! না বাপু, গান-বাজনা আমার আসে না।

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা-গোল্লা। ঘিরে ধরে ভূত দেখাও ভূত দেখাও বলে মহাসোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তাঁর গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।

সে আবার কী?

আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আমসি হয় তেমনই আর কী, বহু পুরোনা জিনিস।

জয়তিলক তার বোঁচকা খুলে একটা জং-ধরা টিনের কৌটো বার করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বেশি গোলমাল কোরো না, এক-এক করে উঁকি মেরে দেখে নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুশকিল।

কী দেখলুম, তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল, শুকনো পলতা পাতার মতো চার-পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নীচে পড়ে আছে। কৌটোর ভেতরটা অন্ধকার বলে ভালো বোঝাও গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।

বলাবাহুল্য ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না হে ঠকায়নি। চৌধুরিবাড়ির বহু পুরোনো লোক হল গোলোক। সারাজীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। আর তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবাটেবা করলাম খানিক কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরোনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেবে করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবই বা কী করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার।

এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, মরার সময় মানুষ বড়ো একটা মিছে কথা বলে না।

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাঁকে। দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়েদেয়ে ভুড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে আমি আর বিশু তাঁর

ভূতের কৌটো চুরি করলুম। একদৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মতো জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হালকা, এত হালকা যে জিনিসগুলো আছে কি নেই বোঝা যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতাটাতা নয়। অনেকটা ঝুল জাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠাণ্ডাও।

বিশু বলল, ভূত কিনা তা প্রমাণ হবে, যদি ওগুলো জেগে ওঠে।

তা জাগাবি কী করে?

আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাঁকার মতো জিনিস নেই।

আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণে মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।

প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দু-খানা কটমট করছে।

ওরে বাবা রে! বলে আমরা দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম, জ্যান্ত ভূতটা আর-চারটে ঘুমন্ত ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

চোখের পলকে পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে-হাসতে আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।

রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হি হি করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি-চাকরদের ভয় দেখায়। সে কী ভীষণ উপদ্রব। ভুতের দাপটে সকলে তটস্থ।

জয়তিলকবাবু এই কান্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তাহলে! ইস, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। না : ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি।

এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন, তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।

দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পাঁচ-পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারি বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর, নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেইরকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো একনাগাড়ে তিন-চার কিংবা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিনমাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন-জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচুগাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু-তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দলবেধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড়ো সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দলবেধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, এ-জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্জে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে-তাকে ঘরেদোরে ঢুকতে দেবেন না।

বেধে

কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ-কান-নাক সব ভোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলেপুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভালো নয়।

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, কাদের কথা বলছেন দিদি?

পালিত-গিন্নি শুধু বললেন, সে আছে বুঝবেনখন।

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। এক মাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধবয়সি বউ এসে বলল, ঝি রাখবেন?

দিদিমা দোনোমনোকরে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন, কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নি মুচকি হাসি হেসে বললেন, ওদের ওরকমই ধারা। ঝি-টার নাম কী বলুন তো?

দিদিমা বললেন, কমলা।

পালিত-গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো।

পালিত-গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ-ঝি রাখুন।

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে?

সে মাথা নীচু করে বলল, মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড়ো লজ্জা পাই।

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে-আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে

ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কী ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও কাঁচকোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহুকষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক

ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনও শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচন্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা–ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসার ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসার ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন–চলে আসুন, সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘ-ভাল্লুক নই..ইত্যাদি। সে-সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসার ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ কী হয়েছে। এবং তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিবের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো কাঁদো মুখে চার-পাঁচ- সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফসসল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা-টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতিআশ্চর্য খেলা।

ভট্টাচার্যও বললেন, হ্যাঁ, অতিআশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি।

দাদামশাই অবাক হয়ে বললেন, সে কী? এ তো আপনিই দেখালেন!

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য।

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়ে বললেন, তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?

সবাই বলল, আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পন্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, আলবাত আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরা এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক

লোক সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এবাড়িতে থাকে কী করে?

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।

কারা? দিদিমা তবু অবাক।

বুঝবে বাপু, রোসো। বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড়ো অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না-গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, ওরে, কে আছিস? বলমাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, যা এটা ডাকে দিয়ে আয়। দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?

সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কী। খুব ভালো ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফরসা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না-ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুঙ্কা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপ-চাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খনাসুরও কেউ টের পায়নি।

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়োমাসি তখন কিছু বড়ো হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মা-র বড়ো লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, আয় রে? অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড়ো হয়েছে, সেই বড়ো আর মেজোমামা যেত বল খেলতে। দুটো পাটিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, কে খেলবি আয়। অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত। মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কান্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার

খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপটেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, ওরা বারোজন খেলছে। রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপটেন বুক ফুলিয়ে বলল, গুনে দেখুন। রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, দেয়ার আর অ্যাট লিস্ট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল পিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফরসা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?

দোমোহানীর ক্যাপটেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

কে? কাদের কথা বলছ?

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুকি, তারপর কথাবার্তা। এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে যেসব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। যেমন বড়োমামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না-থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই

সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না– আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, এই শুনছিস?

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, কী বলছ?

আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি। বলল, দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?

বড়োমামা ধমক দিয়ে বলেন, ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়োমামা বাথরুমের কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, কীসের ভয় বললে না?

বড়োমামা গম্ভীর হয়ে বললেন ভূতের।

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়োমামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে

মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙিমাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা এঁকেই বললেন, এ তো ভালো কথা নয়! গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা এঁকে সে-ও বলল, এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকাপয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তাঁর বাড়ির কারও পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে, দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়। তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহিগঞ্জের মতো ছোটো গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিত্যই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও

যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তা আপনি কে?

আজ্ঞে আমি হলুম পরানচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।

অ। তা কাকে খুঁজছেন?

আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।

তাই নাকি?

আজ্ঞে, তা বাবু, কিছু পেলেন-টেলেন? সোনাদানা বা হিরে-জহরত কিছু?

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনা বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কী আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরান তবু হাল না-ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু, তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছ?

ওই ইয়ে আর কি–ওই যে রামনাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু, অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকটা সসংকোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু, বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু, অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকার্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গবিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড় ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি। ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরান দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরান, তুমি এখন কোথাও যাবে?

পরান একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন-চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরান দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল-সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, চোরটোর নয় তো?

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকাপয়সা কোথায়?

পরান দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা ঘেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কান্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে।

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোল। শুধু পরান দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কান্ড ঘটে কিনা।

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরান দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছ?

যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না-দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?

একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে-আলতায়। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই, এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।

বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

এসব কী করেছ হে পরান? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।

যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসিজাতীয় কিছু।

আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারি, দুজনা না-হলে টেনে তোলা যাবে না।

ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। বললেন, কী আছে ওতে?

তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখঢাকা ভারি কলসিটা দুজনে মিলে অতিকষ্টে তুললেন ওপরে। পরান একগাল হেসে হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।

বেশ বড়ো পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো। যান, আপনার আর কোনো দুঃখ থাকল না। দু তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে।

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরানের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো! স্বপ্ন নয় তো!

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।

ভূতনাথবাবু পরানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।

পরান সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকাপয়সায় আমার কী হবে বাবু?

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?

না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকাপয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?

আজ্ঞে, ওইটে আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পরান দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

জকপুরের হাটে

নটবর সাউ সন্ধে লাগতেই দোকান বন্ধ করে হাট করতে বেরিয়ে পড়ল। শেষ হাটে জিনিসপত্র বেজায় সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানিরা ঝপাঝপ মাল বেচে হালকা হয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন।

জকপুরের হাট বেশি দূরেও নয়। আকন্দপুরের খালটা যেখানে মাওবেড়ের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে শিবতলার মাঠে বিরাট জায়গা জুড়ে হাট। হ্যাঁজাক, টেমি, কারবাইডের আলো চারিদিকে ঝলমল করছে যেন। কেউ কেউ দোকান গুটিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ গোটাচ্ছে আবার কোথাও রমরম করে বিকিকিনি চলছে।

ব্যাপারিরা বেশিরভাগই নটবরের মুখ চেনা। এই যেমন রায়দিঘির বিখ্যাত বেগুন নিয়ে আসে মুকুন্দ পাল। সোনার গাঁয়ের ফুলকপি নিয়ে বসে শিবু গায়েন, চন্ডীগড়ের বড়ো বড়ো লাল মুলো বেচতে আসে হারান দাস। নটবরের অবশ্য আজ অন্য দরকারেও আসা। হাটের পশ্চিম ধারে এক বুড়ো মতো মানুষকে মাঝে মাঝে টেমি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। তার লম্বা সাদা দাড়ি, বিশাল গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বয়স হেসেখেলে অন্তত পঁচাশি হবে। মুখখানার চামড়ায় অনেক ভাঁজ। মাথায় একটা সাদা টুপিও থাকে। মাঝে মাঝে গায়ে লাল রঙের কাপড় জুড়ে তৈরি একটা জোব্বা মতো। এই সাংঘাতিক শীতে খোলা মাঠের দিকে বসে বুড়ো কিছু পুথি-পুস্তক বিক্রি করতে বসে থাকে। গাঁয়ের লোক বইটই বেশি পড়ে না। তাই বুড়োর বিক্রিবাট্টাও নেই। তবুও বুড়ো বসে থাকে। হাটে এসে কৌতূহলের বশে নটবর তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল, বিচিত্র সব নাম-মহাকাশের হাতছানি, পৃথিবীতে আজব মানুষের আগমন, সহজ উড়ন শিক্ষা, জাদুবলে রোগ আরোগ্য, দ্রব্যগুণের সাহায্যে গগনে বিহার।

সবই বুজরুকি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌতূহল এক সাংঘাতিক ব্যাপার, ঝোঁক চাপলে মাথাটা যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। নটবর কেনাকাটা সেরে বুড়োর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টেমির আলোয় ম্লান পুরোনো বইগুলো হলদেটে দেখাচ্ছে। বুড়ো শীতে জবুথবু হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটই আগের দিনই দেখে পছন্দ করে রেখেছিল নটবর–সহজ ভুত নামাইবার কৌশল।

ও দাদু!

বুড়ো চোখ চেয়ে নটবরকে দেখে বেজার মুখে বলে, কী চাই?

এই বইখানার কত দাম?

এক টাকা।

বইতে যা লেখা তাতে কাজ হয়?

কে জানে বাপু, আমি তো পরখ করিনি!

কাজ না-হলে বই ফেরত দেব কিন্তু?

না বাবু, ওসব ফেরতটেরত হবে না। নিলে নাও, না-নিলে পথ দেখো।

আহা, এসব তো বুজরুকিও হতে পারে?

তা হতে পারে!

নটবর একখানা টাকা ঠকাং করে ফেলে বইখানা তুলে নিল। গেল একখানা টাকা। তা আর কী করা যাবে।

বইখানা পকেটে পুরে নটবর বাড়ি রওনা হল।

না, ভূতে নটবরের বিশ্বাস নেই। সে ভূতটুত মানে না। এই নিয়ে বন্ধু ভজহরির সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক হয়। ভজহরি আবার ঘোরতর ভূতে বিশ্বাসী। প্রায়ই বলে, এখন মানছ না, কিন্তু একদিন ঠেলায় পড়ে মানবে।

ভূত না-মানলেও কৌতূহলকে তো আর ঠেকানো যায় না।

আজ বড়োই শীত পড়েছে। তার গ্রাম শামুকখোলা একটু দূরেই। ভারি থলি দু-খানা দু-হাতে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য জোরেই হাঁটছে নটবর। কুয়াশায় পথঘাট আবছা, তবে একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রথতলা ছাড়িয়ে আমবাগানের পাশের রাস্তায় সবে পা দিয়েছে–এমন সময় একটা লোক পিছন থেকে তার পাশাপাশি এসে পড়ল।

লোকটা বলে উঠল, শামুকখোলা যাচ্ছেন নাকি মশাই?

হ্যাঁ।

ভালো ভালো। তা হাটে আজ কেমন কেনাকাটা হল?

এই টুকিটাকি।

মুলো, বেগুন সব পেলেন?

তা পেলুম।

বেশ বেশ।

তা আপনি কোনদিকে?

এই একটু বিষয় কার্যে এসে পড়েছিলুম এই দিকে। তা আর কী কিনলেন?

এই ঘরগেরস্থের টুকিটাকি জিনিস।

লোকটা হেসে বলল, আছে কিন্তু।

কী আছে?

ওই যা বলছিলাম আর কি। আচ্ছা মশাই আসি, এই ডানহাতি আমার রাস্তা।

নটবর ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। উটকো লোকটা যে কোথা থেকে উদয় হল, কোথায় অস্ত গেল কে জানে।

সামনেই বাঁ-ধারে কপালী দিঘি। চারধারে গাছগাছালি। দিঘির কোল ঘেঁসে রাস্তাটা পেরোনোর সময় হঠাৎ নটবরের মনে হল সামনের ঘাটে কে যেন চান করছে। এই শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে চান করে কে?

ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখল চান করে একটা মোটাসোটা লোক উঠে এল। গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, হাটে গিয়েছিলেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনি এই শীতে রাতে চান করছিলেন যে?

চান না-করলে শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করে। সারাদিনে আমি বার পঁচিশেক চান করি কি না!

বলেন কী? ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে?

লোকটা একটু হেসে বলে, আরে না, নিউমোনিয়া কি আর সকলের হয়! তা হাটে কী কী। পেলেন?

এই একটু শীতের শাকপাতা।

শুধু শাকপাতা?

আর এই টুকিটাকি।

শুধু টুকিটাকি।

এই সামান্য জিনিসপত্তর।

লোকটি গা মুছতে মুছতে বলল, তা বলে ভাববেন না যে নেই।

কী ভাবব না?

এখনও আছে, অনেক আছে। যাই আর একবার ডুব দিয়ে আসি।

লোকটা ফের জলে নেমে গেল। হ্যাঁ! আচ্ছা পাগল তো!

গাঁয়ের কাছ বরাবর চলে এসেছে নটবর। জটেশ্বরের খালের সাঁকোটা পেরোলেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়বে।

সাঁকোতে পা দিতেই নটবর দেখতে পেল সাঁকোর মাঝ বরাবর বাঁশের রেলিং-এর হাতে ভর রেখে একটা লোক ঝুঁকে জলের দিকে চেয়ে আছে। নটবর সাঁকোতে উঠতেই মচাৎ করে শব্দ হওয়ায় লোকটা ফিরে তাকাল। চেনা মানুষ নয়।

নটবরবাবু নাকি?

হ্যাঁ।

হাট করে ফিরলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?

মাছ ধরছি।

মাছ ধরছেন!

মাছ ধরছেন! বলে নটবর হাঁ হয়ে গেল! সাঁকোর ওপর থেকে এই রাত্তিরে মাছ ধরা যায় বলে সে জন্মে শোনেনি। হেসে বলল, কীভাবে ধরছেন? মন্তর দিয়ে নাকি?

না ছিপ দিয়ে। দেখবেন? লোকটার হাতে যে ছিপ রয়েছে সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি নটবর। এবার করল। লোকটা ডান হাতের ছিপটা হঠাৎ করে ছপাৎ করে ওপরে তুলতেই দেখা গেল বঁড়শিতে বেশ বড়োসড়ো একটা মাছ লাফঝাঁপ করছে। তাজ্জব ব্যাপার।

দেখলেন তো নটবরবাবু?

দেখলাম। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।

না, না, এ আর বিস্ময়ের কী? তা হাটে যা খুঁজতে গিয়েছিলেন তা পেলেন?

তা পেলাম, শীতের শাকসবজি আর কি!

উঁহু, ওসব নয়। আর যা খুঁজতে গিয়েছিলেন।

এই টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। ঘরগেরস্থালিতে তো কত কিছুই লাগে।

সে আমি জানি। কিন্তু সে-সব ছাড়া আর কিছু?

না, আর বিশেষ কী?

কী যে বলেন নটবরবাবু। যাকগে, কথাটা হল–ওসব নিয়ে বেশি মাথা না-ঘামানোই ভালো।

কী সব নিয়ে! কীসের কথা বলছেন?

বলছিলাম কী, দু-তরফা নিজের নিজের মতো করে আছে। কাজ কী বলুন অন্য তরফের তল্লাশ নিতে যাওয়ার। ওতে অন্য তরফের বড্ড অসুবিধে হয় কিনা।

দুই তরফা! নটবর হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কোন তরফের কথা বলতে চাইছে লোকটা?

আচ্ছা আসি নটবরবাবু। বলে লোকটা হনহন করে তার পাশ কাটিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। তাকে ভেদ করেই গেল যেন! কিন্তু নটবরের গায়ে একটু ছোঁয়াও লাগল না। হঠাৎ নটবরের গা শিউরে উঠল।

বাপরে! বলে বাজারের থলি ফেলে নটবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পড়ি কি মরি অবস্থা।

পরদিন সে ভজহরিকে গিয়ে বইখানা দান করে বলল, আছেরে ভাই আছে।

ভজহরি একগাল হেসে বলল, বলেছিলাম কি না।

টেলিফোনে

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গন্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড়ো অফিসার। বহুবছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুষ্টু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড়ো পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুঙ্গু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরের লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন,

গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক বেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাঁচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, হ্যালো! হ্যালো!

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তাহলেও তো ওপাশ থেকে কেউ-না-কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা-বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনো গন্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।

কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।

হয়তো ক্রস কানেকশান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহুপুরোনো, তাই মাঝে-মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশান কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে সিক্স ফোর নাইন ওয়ান ... গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদবেগটাও আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে...।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট?

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, দিস ইজ দ্য ডে... দিস ইজ দ্য ডে... প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতিমিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড়ো ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছোনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গলফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোঁপজঙ্গল, জলা। অনেক গলফ খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোঁপজঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নীচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, দিস ইজ দ্য ডে...

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচন্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশেপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

হ্যালো।

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, এই নম্বর তো!

হ্যাঁ। আপনি কে?

আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?

প্রদীপ রায়।

ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?

না। বিলটা একটু ইরেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।

খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।

বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।

হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কান্ড হচ্ছে...

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট।

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

ঢেকুর

প্রায় চোদ্দো পুরুষের বসতবাড়িটা দারুব্রহ্মবাবুকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। একে তো বড়ো বাড়ি কেনার খদ্দের নেই, তার ওপর যদি বা খদ্দের জোটে, তারা ভালো দাম দিতে চায় না। বলে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে ও বাড়ি কিনে হবেটা কী? কথাটা সত্যি? তবে বহুকাল আগে এ গ্রাম ছিল পুরোদস্তুর একখানা শহর। এই বাড়িতে দারুব্রহ্মের যে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ বাস করতেন, তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের রাজা। তখনকার আস্তাবল, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পদ্মদিঘি, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, নহবতখানা, শিশমহল সবই এখনও ভগ্নদশায় আছে। ফটকের দু-ধারে মরচে পড়া দু-দুটো কামানও। এতদিনে খদ্দের পাওয়া গেছে।

দারুব্রহ্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এ বেলা ভাত জুটলে ও বেলা খুদও জুটতে চায় না। নিজে বিয়ে করেনি। বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ গত হয়েছেন সুতরাং বুড়ি মা আর তার দু-মুঠো জুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু বংশের নিয়ম মানতে হয় বলে, একপাল অপোগন্ড নিষ্কর্ম আত্মীয়স্বজনকে ঠাঁই দিতে হয়েছে। তারা দিনরাত চেঁচামেচি করে মাথা ধরিয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই দারুব্রহ্মের চুল পাকতে লেগেছে, আশা-ভরসা গেছে। বুড়ি-মা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছেন। কিন্তু মেয়ের বাপ এই হাড়-হাভাতের হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। অপমানটা খুব লেগেছে দারুব্রহ্মের। বাড়ি কেনার খদ্দের জুটে যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে মায়ে-পোয়ে কাশীবাসী হবে, ঠিক করেই রেখেছে।

শেষবার চোদ্দো পুরুষের বসতবাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল দারুব্রহ্ম। ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ সত্যব্রহ্ম ছিলেন দারুণ মেজাজি। একটা মশা সেবার তাঁর নাকে হুল ফোঁটানোয় রেগে গিয়ে তিনি মশা মারতে কামান দাগার হুকুম দেন। কিন্তু তোপনার এসে খবর দিল, কামানের মশলা নেই। সত্যব্রহ্ম তখন বলেন, কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক আনো। শোনা

যায়, কম-সে-কম শত খানেক গুলি চালানোর পর মশাটা বাস্তবিক মরেছিল। এখনও দরবার ঘরের দেওয়ালে সেইসব গুলির জখম রয়েছে। দারুব্রহ্ম সেগুলির ওপর হাত বুলিয়ে একটা-দুটো-তিনটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলল। ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মের খুব শিকারের শখ ছিল। তাই বলে জঙ্গলে-টঙ্গলে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বা মাচানে বসে শিকার করতেন না। খুব আমুদে অলস লোক। দোতলা থেকে নীচে নামতে হলেই গায়ে জ্বর আসত। তিনি দোতলায় একটা আলাদা ছাদ তৈরি করে মাটি ফেলে জঙ্গল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা শেকলে-বাঁধা বাঘ থাকত। তিনি জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে বাঘের দেখা পেলেই গুলি করতেন। আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়ত। অবশ্য সবাই জানত, বন্দুকে ভরা গুলিটা আসলে ফাঁকা গুলি। আর বাঘটা ছিল পোষা। সেই একই বাঘই কত বাঘের-মরণ-মরেছে। দোতলায় উঠে দারুব্রহ্ম সেই জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে।

ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণব্রহ্ম ছিলেন পালোয়ান। দু-হাতে দু-মণ ওজনের দুটো মুগুর ঘুরিয়ে রোজ দু-বেলা ব্যায়াম করতেন। সেই মুগুর দুটো দোতলার সিঁড়ির মুখেই রাখা। দারুব্রহ্ম মায়াভরে সে দুটোকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

তিনতলার সব ঘর বহুকাল হল তালাবন্ধ। ছাদ ফেটেছে, জানলার শিক নেই। বাদুড় চামচিকের বাসা। যত রাজ্যের পুরোনো জিনিসের আবর্জনা ডাঁই করে রাখা। শেষবারের মতো সবকিছু দেখে যাওয়ার জন্য দারুব্রহ্ম তালা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরে। কাঠের সিন্দুক, দেয়াল আলমারি, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন, পুরোনো নাগরা, ভাঙা খাট, কত কী চারদিকে ছড়ানো।

কাঠের সিন্দুক খুলে এটা-সেটা নাড়াচড়া করছিল দারুব্রহ্ম, আর এটা-সেটা ভাবছিল। এমন সময় হাত ফসকে কী একটা যেন মেঝেয় পড়ে গেল। একটু চমকে উঠল দারুব্রহ্ম। চমকাবারই কথা। জিনিসটা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঝলকানি আর সেইসঙ্গে খানিক ধোঁয়া বেরোলো। দারুব্রহ্ম জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, সেটা একটা প্রদীপ।

প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, চোখে পড়ল ধোঁয়ার কুন্ডলিটা সামনেই পাকিয়ে-পাকিয়ে একটা লম্বা রোগা সুটকো লোকের চেহারা নিচ্ছে।

কে রে! দারুব্রহ্ম চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা গোটা চারেক হাই তুলে দিয়ে বলল, আমি? আমি হচ্ছি প্রদীপের দৈত্য।

দারুব্রহ্ম হাঁ। ব্যাটা বলে কী? সে বলল, ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? দিনে-দুপুরে ব্যাটা চুরির মতলবে বাড়িতে ঢুকে বসে আছ।

লোকটা ভয় খেয়ে বলে, সত্যিই না। অনেককাল কেউ ডাকাডাকি করেনি বলে বেশ হাজার

দেড়েক বছর একটানা ঘুমিয়ে এই উঠলাম। চুরি-টুরি কিছু হয়ে থাকলে আমি কিন্তু জানি না।

দারুব্রহ্ম সাহসী বংশের লোক। সহজে ভয় খায় না। তবে সে বুঝল, লোকটা গুল দিচ্ছে না। প্রদীপটাও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হতে পারে। তার বংশের অনেকেরই নানা বিদঘুঁটে জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল। সে বলল, বটে? তা, তোর কাজটা কী?

আবার গোটা কয়েক হাই তুলে বিশুদ্ধ বাংলাতেই লোকটা বিরস মুখে বলল, আমার কাজ কী? দেড় হাজার বছর পরে ঝুটমুট কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন এখন যা করতে বলবেন, তাই করতে হবে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি প্রথমেই শক্ত কাজ দেবেন না। আমার এখনো ঘুমের রেশ কাটেনি। গা ম্যাজম্যাজ করছে।

দারুব্রহ্ম বুঝল, এ ব্যাটা আলাদিনের সেই দৈত্যই বটে, তবে ফাঁকি মারার তাল করছে। সে বলল, বাপু হে অত রোয়াব দেখালে কি চলে? বরাবর অনেক বড়ো-বড়ো কাজ করে এসেছ খবর রাখি। এখন পিলোলে চলবে কেন?

লোকটা ব্যাজার হয়ে বলে, সে করেছি, কিন্তু বহুকাল অভ্যাস নেই কিনা। তা ছাড়া ঘুমোলে হবে কী, খাওয়া তো আর জোটেনি। দেড় হাজার বছর টানা উপোস। শরীরটা দেখুন না কেমন

শুকিয়ে গেছে। আগে বরং কিছু খাবার-দাবার দিন।

তারপর?

তারপর যা বলবেন, একটু-আধটু করে দেব। দারুব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। দৈত্যটার সিঁড়িঙ্গে চেহারা দেখে তার কষ্টও হল। বলল, চলো দেখি, মুড়িটুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা। বলে লোকটাকে সঙ্গে নীয়ে নীচে নামল দারুব্রহ্ম। বাড়ির কেউ লোকটাকে দেখে তেমন গা করল না। গা করার মতো কিছু নেই। দারুব্রহ্ম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে ধামা ভরে মুড়ি আর বাতাসা খাওয়াল। সবশেষে দেড় ঘটি জল খেয়ে লোকটা বলল, এ যা খাওয়ালেন, এতে তো একটা সেঁকুরও উঠবে না। যাকগে, ওবেলা কী রান্না হবে?

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, একদিন এ বাড়ির অতিথিরা মাংসপোলাও খেয়ে একটা করে মোহর দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেদিন তো আর নেই। ও-বেলা যদি হাঁড়ি চড়ে, তবে দুটো ডাল-ভাত জুটতে পারে।

লোকটা মন খারাপ করে বলল, ডাল-ভাত। ছো:।

দারুব্রহ্ম হেসে ফেলে বলল, তুমি দেখি উলটো কথা বলতে লেগেছ। প্রদীপের দৈত্যই কোথায় খাবার-দাবার জোগাড় করে আনবে, তা না, তুমিই উলটে চাইতে লাগলে।

লোকটা জবাব দিল না। ধোঁয়া হয়ে প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে দারুব্রহ্ম প্রদীপটা ঠুকে আবার দৈত্যটাকে জাগায়। দৈত্যটা চারজনের খোরাক একা খেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আমার খোরাকটা একটু বেশিই। তা ভরপেট না হলেও

ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা ঢেকুর তো উঠবে। এতে তো একটা ঢেকুরও উঠল না। একটা হাই তুলে যাই ঘুমোই গিয়ে বলে দৈত্যটা আবার প্রদীপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পরদিন দেখা গেল দৈত্যকে একবেলা খাওয়াতে গিয়েই চালের ডোল ফাঁকা হয়ে গেছে। দারুব্রহ্ম ভাবল, আহা বেচারা। কতকাল খায়নি। একদিন তো ব্যাটার কাছ থেকে সুদে-আসলে সবই উশুল করব কদিন বরং পেট ভরে খাক।

দারুব্রহ্ম পুরোনো সব দলিল-দস্তাবেজ বের করে খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান পেল, চৌমারির চরে তাদের কিছু জমি বহুকাল ধরে আছে, কিন্তু খাজনা বা ফসল আদায় হয়নি। একটা তেলকলের অংশীদারিরও সন্ধান পেল। খুঁজে পেতে দেখল, পুরো একটা তহসিলের খবরও সে এতকাল রাখত না। ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দারুব্রহ্ম। দাগ-নম্বর ধরে-ধরে খুঁজে পেতে জমির সন্ধান পেল। প্রজারা তাকে দেখে প্রথমে একটু বেগড়বাই করলেও স্বীকার করল যে বহুকাল তারা খাজনা বা ফসল দেয়নি। বাবা-বাছা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে দারুব্রহ্ম কিছু আদায় করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোড়ল চোখ মুছতে মুছতে এসে বলল, জমির মালিককে বঞ্চিত করেছি বলেই আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। আপনি যান। আমরা নিজে থেকেই পৌঁছে দেব যা দেওয়ার।

দারুব্রহ্ম তেলকলে গিয়ে দেখল, সেটা বেশ রমরম করে চলেছে। দারুব্রহ্ম কাগজপত্র বের করে তার দাবিদাওয়া জানাতেই তেলকলের মালিক মূর্ছা গেল। আর মূর্ছা ভেঙে উঠেই বলল দলিলে দেখছি, আপনি দশ আনার মালিক। তবে আমার থাকবে কী? যাকগে এসব তো জানা ছিল না। কবেকার কথা সব। এখন একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। আপনি যান।

তহসিলদারটাও দারুব্রহ্মকে হতাশ করল না। প্রজারা বলল, আমরা কি জানি ছাই যে, এ জমিরও মালিক আছে। তবে আমরা নিমকহারাম নই, বঞ্চিত করব না।

দিন দুই বাদে দারুব্রহ্ম বাড়িতে ফিরে দেখে, চারটে গোরুর গাড়ি বোঝাই ধান, দু-কলসি কাঁচা টাকা আর আনাজপাতি তেল মশলা সব এসেছে, সেদিন দারুব্রহ্ম বাড়তি দশজনের রান্না রাঁধিয়ে প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে বের করে বলল, খাও বাপু, পেট ভরে খাও। এ বাড়িতে অতিথির ঢেকুর ওঠে না, একথা শুনলে আমার পূর্বপুরুষেরা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবে।

কিন্তু উঠল কই? দশজনের ভাত সাবাড় করে দৈত্য করুণ মুখে বলল, বটে?

দারুব্রহ্ম হাঁ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা বিশজনের খোরাক শেষ করেও কিন্তু দৈত্য ঢেকুর তুলল না। সাতদিনেই চার গোরুর গাড়ির চাল শেষ। বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, এত খেয়েও দৈত্যটার ঢেকুর উঠছে না। তারা রোজ দুবেলা এসে খাওয়ার সময় দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কবে কখন ঢেকুর ওঠে। কিন্তু উঠল না। ঢেকুর না উঠলেও পাহাড়-প্রমাণ খাওয়ার ফলে কদিনের মধ্যেই সিঁড়িঙ্গে দৈত্যটার চেহারা পুরোপুরি ঘটোৎকচের মতো হয়ে উঠল। মুগুরের মতো হাত, পাটাতনের মতো বুক, মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো লম্বা।

দারুব্রহ্মেরও জেদ চেপেছে। তাদের এত বড়ো রাজবংশে একটা পুঁচকে দৈত্য এসে খেয়ে ঢেকুর তুলছে না-কেমন কথা! এ বাড়িতে ভোজ খেয়ে লোকে পাক্কা দেড়দিন মেঝেয় পড়ে থাকত। দু-চারজন ভোজ খেয়ে গঙ্গাযাত্রায় পর্যন্ত গেছে! সেই বাড়ির এই অপমান?

দারুব্রহ্ম নাওয়া-খাওয়া ভুলে আদায়-উশুল করতে লাগল। তেলকলের ভার নিজে নিল। আরও সব নতুন-নতুন কারবার খুলতে লাগল। গাড়ি-গাড়ি চাল আসছে বাড়িতে, বস্তা-বস্তা আনাজ, ঘি, দুধ, দই। এসবই একদিন দৈত্যের ওপর দিয়ে উশুল হবে। আগে ব্যাটা ঢেকুরটা তো তুলুক।

এর মধ্যেই একদিন বাড়িতে খদ্দের এনে হানা দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা, দারুব্রহ্ম প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে মাত্র খেতে ডেকেছে। দৃশ্যটা দেখে খদ্দের চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আসেনি। কিন্তু বাড়ি বিক্রি এখন মাথায় উঠেছে

দারুব্রহ্মের। বিক্রির মানেও হয় না। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপটা যখন হাতে পেয়েছে, তখন আর অভাবও থাকবে না। খামোকা পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি করবে কেন? সে তাই মিস্ত্রি ডেকে বাড়িটা মেরামত করাতে লাগল। সব খরচই উশুল হবে।

মৌরসি পাট্টায় আরও কিছু জমি নিল দারুব্রহ্ম। চাষবাস বাড়িয়ে ফেলল। কারবারগুলিও বেশ ফেঁপে-ফুলে চলছে। গোশালায় গোরু, আস্তাবলে ঘোড়া, বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি। শুকনো বাগানে আবার গাছ লাগানো হল, তাতে ফুল ফুটল, বাড়িটা কলি ফেরানোর পর আবার ঝলমল করতে লাগল। এর মধ্যেই দারুব্রহ্মের জন্য যে মেয়েটি দেখা হয়েছিল, তার বাবা এসে হাতজোড় করে বলল আমার মেয়েটি নিলে ধন্য হই। তা তিনি হলেনও। নহবতখানায় সানাই বাজল, দারুব্রহ্ম বিয়ে করে এসে বিরাট ভোট দিয়ে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াল।

কিন্তু সাত গাঁয়ের লোকের মতো খাবার একা খেয়েও ব্যাটা দৈত্য কিন্তু ঢেকুর তুলল না! তবে বলল, খিদেটা এবারে একটু কমেছে। পেটের জ্বলুনিটা তেমন নেই। বলে ফের ঘুমোতে চলে গেল। নতুন বউয়ের সামনে এই অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারুব্রহ্মের। বলতে নেই সে এখন লাখোপতি! একটা দৈত্যের পেট ভরাতে পারবে না? পরদিন থেকে সে কাজকর্ম দ্বিগুণ করে দিল।

মাসখানেক বাদে সে একশো গাঁয়ের লোকের আয়োজন করে দৈত্যটাকে ডাকল। খুবই লজ্জার সঙ্গে প্রকান্ড চেহারার বিকট দৈত্যটা এসে বসল আসনে। আচমন করে একটু ভাত মেখে মুখে দিয়েছে কি দেয়নি অমনি একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আঁতকে উঠল সবাই। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। পরপর তিনবার। অমনি চারদিকে হইহুল্লোড়-ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। বাচ্চারা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। তুলেছে। তুলেছে। দৈত্য ঢেকুর তুলেছে।

মাথা নীচু করে দৈত্যটা উঠে পড়ল। আঁচিয়ে যখন প্রদীপের মধ্যে ঢুকতে যাবে, তখনই গিয়ে দারুব্রহ্ম তাকে ধরল, এই যে বাপু। এই দিনটারই অপেক্ষা করছিলাম। ঢেকুর তো তুললে, তো কাজকর্ম কিছু করতে হয়।

দৈত্যটা অবাক হয়ে চেয়ে বলল, আপনি হুকুম করলে সবই করতে হবে মালিক। কিন্তু কাজটা আর বাকি রেখেছেন কী? লোকে আমাকে পেলেই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, ধনদৌলত চায়। আমি দিইও। কিন্তু আপনার যা দেখছি, এর ওপরেও আমাকে কিছু করতে হবে নাকি?

দারুব্রহ্ম কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। এখন দেখল। বাস্তবিকই তার যা আছে তার ওপর আরও কিছু চাওয়ার মানেও হয় না। সে মাথা চুলকে বলল, তা বটে, তবে কিনা–

দৈত্যটা করুণ মুখ করে বলল, যে বাড়িতে খেয়ে আমার ঢেকুর ওঠে, বুঝতে হবে সে বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো অভাব নেই। ঝুটমুট আমাকে আর খাটাবেন কেন? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা আর কয়েক হাজার বছর চালাতে দিন। শরীরটা বড়ো ম্যাজম্যাজ করছে।

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, তাই হোক।

দৈত্যটা প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দারুব্রহ্ম সেটাকে আবার সাবধানে কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখল।

দুই পালোয়ান

পালোয়ান কিশোরী সিং-এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাকপক্ষীতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভালো জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই। চেলাচামুন্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোনো সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে, একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকাল উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও না কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। সন্ধ্যের পর একটু গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে একঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা-হাত-পা দাবিয়ে দেয় তার সাগরেদরা। এই নিচ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢোকবার কোনো ফাঁকই পায় না। গণপতি মাহাতো নামে আর-একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ-বিদেশের বিস্তর দৈত্য-দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাত করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিত করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন-পন করতে লাগল হাঁচি

দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিত করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর-এক কান্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে ভ্রু প্যাঁচ আটছিল গণপতি। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় খেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লন্ডভন্ড কান্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপতি দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকে তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, গণপতি, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড়ো ভয়ংকর জিনিস।

গণপতি বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপতি অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপতি লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে-ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতিকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপতি কিছু গন্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে জুতসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিত হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিত হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাত হল। গণপতি রাগে দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতির সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনো আশা নেই। কিশোরী তখন গণপতির নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেইসব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেই সময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নীচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতির মাথার মধ্যিখানে।

গণপতির ভালো করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপতি কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে তুলসী দাসের রামচরিতমানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিত করে তখনও সে নাকি কিছুমাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজিকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতির বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে-ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতিকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারি নামডাক। বড়ো-বড়ো ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ-মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মত পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতির আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ।

একবার মশা একবার ষাঁড়, আর-একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর-একবার লড়বার বড়ো সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারলে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারলে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপতি খুব বড়ো পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন-তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে-জিততেও হেরে গেছে। অতবড়ো একটা পালোয়ানের এই সামান্য আবদারটুকু রাখতে কোনো দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তা ছাড়া গণপতিকে যে সে খুব ভালোভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই-ই সুযোগ। এবার গণপতিকে ন্যায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপতি অপেক্ষা করছিল কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল, এসেছ। তাহলে লড়াইটা হয়ে যাক।

কিশোরীও গোঁফ চুমড়ে বলল, হোক। দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দু-দিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতিকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপিট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সপাটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধাল। হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিত করে দিল।

গণপতি বলল, আর-একবার।

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, আলবাত। দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিত।

গণপতি বলল, আর-একবার হবে?

কিশোরী বলল, নিশ্চয়ই।

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী পাখি সব করে রব আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিত হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতিকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই নয়! কেমন যেন কালো-কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

জীব? না অন্য কিছু?

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতিও আস্তে-আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায়নি, বাবা রে মা রে বলে চেঁচিয়ে দৌড়োতে লেগেছে।

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

দুই ভূত

লালু আর ভুলুর কোনো কাজ নেই। তারা সারাদিন গল্প করে কাটায়। সবই নিজেদের জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা। কথা বলতে-বলতে যখন আর কথা কইতে ভালো লাগে না তখন দুজনে খানিক কুস্তি লড়ে। তাদের কুস্তিও খুব একঘেয়ে-কেউ হারে না। কেউ জেতে না। কুস্তি করে তাদের ক্লান্তিও আসে না, ঘামও ঝরে না। তার কারণ লালু আর ভুলু দুজনেই ভূত। প্রায় চোদ্দো বছর আগে দুই বন্ধু মনুষ্য জন্ম শেষ করে ভূত হয়ে লালগঞ্জের লাগোয়া বৈরাগী দিঘির ধারে আশ-শ্যাওড়ার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকেই বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বুড়ো বয়সে মাত্র সাত দিনের তফাতে লালু আর ভুলু পটল তোলে। ভূত হয়ে যখন দুজনের দেখা হল তখন দু-জনের মনে হল পুরোনো ঝগড়া জিইয়ে রাখার আর কোনো মানেই হয় না। তাই দু-জনের বেশ ভালো ভাব হয়ে গেল। সময় কাটানোর জন্য তারা মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করেও দেখেছে। কিন্তু দেখা গেল ঝগড়াটা তেমন জমে না, আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় হল তারা ভূত হয়ে ইস্তক এ তল্লাটে কোথাও কখনও আর কোনো ভূতের দেখা পায়নি।

ভুলু বলে, হ্যাঁরে লালু, গাঁয়ে গত চোদ্দো বছরে তো বিস্তর লোক মরেছে, তাদের ভূতগুলো সব গেল কোথায় বল তো?

সেটা তো আমিও ভাবছি, আমরা ছাড়া আর কাউকে তো কখনো দেখিনি! আরও কয়েকজন থাকলে সময়টা একটু কাটত ভালো।

ব্যাপারটা কিন্তু বড্ড গোলমেলে।

আমারও ভালো ঠেকছে না! বেশিদিন এরকম চললে আমাদের এ গাঁ ছাড়তে হবে। সেটা কি সোজা! আমি গাঁ ছাড়ার চেষ্টা করে দেখেছি, ভারি সূক্ষ্ম একটা বেড়া আছে। চোখে দেখা যায় না এতই মিহি, সেই বেড়া ভেদ করা অসম্ভব।

বটে, এ তো ভারী অন্যায় কথা! আমরা কি সব জেলখানার কয়েদি নাকি রে?

মনে হয় এক জায়গার ভূত অন্য জায়গায় গেলে হিসেবের গোলমাল হবে বলেই যমরাজা বেড়া দিয়ে রেখেছে।

তা অলপ্পেয়ে যমরাজটাই বা কোথায়? আজ অবধি তো তার দেখাঁটি পেলাম না।

হবে রে হবে। এই একঘেয়ে বসে থাকাটা আমার আর ভালো লাগছে না। বরং গাঁয়ের ভূতগুলো কোথায় গায়েব হচ্ছে সেটা জানা দরকার। আরও গোটা কয়েক হলে দিব্যি গল্পটল্প করা যেত। দল বেঁধে থাকতাম–

তাহলে খুঁজেই দেখা যাক।

তাই চলো।

দুই বন্ধু মিলে অতঃপর ভূত খুঁজতে বেরল। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে হয়রানিই সার হল। একটা ভূতের গায়ের আঁশও দেখা গেল না।

বড়ো চিন্তার কথা হল রে লালু!

বটেই তো এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

একটা কথা বলি, যতীন মুৎসুদ্দির বয়স হয়েছে। অবস্থাও ক-দিন ধরে খারাপ যাচ্ছে। এখন তখন অবস্থা। চল তো গিয়ে তার শিয়রে বসে থাকি। আত্মাটা বেরলেই খপ করে ধরবখন।

কথাটা মন্দ বলোনি। তাহলে চলো যাই।

দুজনেই গিয়ে যতীন মুৎসুদ্দির শিয়রে আস্তানা গাড়ল। খুব সতর্ক চোখে চেয়ে রইল যতীনের দিকে। যতীন বুড়ো মানুষ। শরীর জীর্ণ, শক্তিও নেই।

দুদিন ঠায় বসে থাকার পরে তিনদিনের দিন যখন গভীর রাত তখন লালু আর ভুলু লক্ষ করল যতীনের আত্মাটা নাকের ফুটোর কাছে বসে সাবধানে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

লালু চেঁচিয়ে উঠল, ওই বেরচ্ছে। সাবধান রে ভুলু, ঘ্যাঁচ করে ধরতে হবে কিন্তু।

হ্যাঁ, একবার বেরক বাছাধন।

তা আত্মাটা বেরল বটে, কিন্তু ধরা গেল না। শরীর ছেড়ে হঠাৎ এমন চোঁ করে এরোপ্লেনের মতোই উড়ে গেল নাকের ফুটো দিয়ে লালু-ভুলু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর ধর-ধর করে ছুটল পিছনে।

যতীন মুৎসুদ্দির আত্মা সোজা গিয়ে গণেশ গায়েনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পিছু-পিছু লালু আর ভুলু।

গণেশ গায়েন যতীনের আত্মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, এসেছিস, তোকে নিয়ে সাত হাজার সাতশো পনেরোটা হল। দাঁড়া যতেন দাঁড়া তোর শিশিটা বের করি। মলমটলম ভরে একদম রেডি করে রেখেছি। এই বলে একটা দুই ইঞ্চি সাইজের শিশি বের করে যতীনকে তার ভিতরে পুরে কয়েকটা নাড়া দিয়ে ছিপি বন্ধ করে তাকে রেখে দিল। তারপর আপন মনেই বলল, আর দুটো হলেই কেল্লা ফতে। পরশু ঝুনঝুনওয়ালা লাখখানেক টাকা নিয়ে আসবে। সাত হাজার সাতশো সতেরোটা হলেই লাখ টাকা হাতে এসে যেত। টাইফয়েড হয়ে চোদ্দ বছর আগে শয্যা নিতে হল বলে লালু আর ভুলুর ভূত দুটো হাতছাড়া হল, নইলে আমাকে আজ পায় কে? সে দুটোকে পেলে হত।

লালু-ভুলু দরজার আড়াল থেকে কথাটা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

গণেশ গায়েন ঘুমোলে তারা ঘরের তাকে জমিয়ে রাখা সাত হাজার সাতশো পনেরোটা শিশি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকটিতে একটা করে ভূত মলম মেখে ঘুমিয়ে আছে।

লালু দেখেছিস!

দেখছি রে ভুলু, কী করবি?

আয়, শিশিগুলোকে তাক থেকে ফেলে আগে ভাঙি। তাই হল। দুজনে মিলে নিশুত রাতে ঝনঝন করে শিশিগুলোকে ঠেলে ফেলে দিল মেঝেতে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমন্ত ভূতেরা জেগে মহা কোলাহল শুরু করে দিল।

ভুলু তাদের সম্বোধন করে বলল, ভাই বোনেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি।

সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। গণেশ গায়েনও ঘুম ভেঙে উঠে ধমকাতে লাগল, চুপ চুপ বেয়াদব কোথাকার! তাদের তো মন্তর দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

কে শোনে কার কথা! ভূতেরা মহানন্দে চিৎকার করতে-করতে লালু-ভুলুর সঙ্গে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

গণেশ দুঃখ করে বলল, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় রে! কত ভালো কাজ হত তোদের দিয়ে। ঝুনঝুনওয়ালা তোদের নিয়ে তার আয়ুর্বেদ ওষুধের কারখানায় চোলাই করে কর্কট রোগের ওষুধ বানাত, তা তোদের কপালে নেই। তা আমি আর কী করব?

ধুলোটে কাগজ

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড় একা পড়ে গেল সে। মাকে ভালোবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ-ছ-টা ঘর। সব পুরোনো জিনিসে ঠাসা। পুরোনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়া-ট্যাকড়া, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালা-কুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড় হু-হুঁ করে বুক।

গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি না। সুদে-আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে!

নিরাপদ হাঁ। বলল, কীসের টাকা?

পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, এই দেখ, তোর বাপের সই। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে আসলে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোটো ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করার সাহস পায় না।

নিরাপদ মিনমিন করে বলল, তা আমাকে কী করতে হবে?

পশুপতি রায় ভ্রু কুঁচকে বলল, পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্যকর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তাহলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।

নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।

তাহলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকান্ডই যাবে আমার। দু দিন সময় দিলুম। পরশুদিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দুটো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনো জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরোনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উশুল হয়।

পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো ষন্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দুজনেই ভারি গম্ভীর।

নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে। পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। মুকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।

নিরাপদ একটু ভালোমানুষ আর একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনো জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।

পাইক দুজন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে। ঘরের চাল-ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু-একটা পুরোনো বাসন বেচে দিয়ে চাল-ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল-ঘেরা ছোটো উঠোন। দুটো পেঁপেগাছ। একটা আম আর পেয়ারাগাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর

মাথায় কোনো মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।

এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু-পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দুটো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, তোর এতবড়ো সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস?

অন্যজন বলল, বেয়াদব, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাঁট্টা মারলি!

নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, আ-আমি! কাকুরা কী যা-তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসেছিলাম!

প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?

প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, দে না আমার হাতে ছেড়ে, গাঁট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

নিরাপদ জীবনে কারো কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুন্ডু করে পেল্লায় একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।

এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এই বিষ্ণু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, আমি কিল মারলাম! বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!

মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাঁট্টা মেরে গিয়ে ভালোমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।

দেখ পটা, বেশি বাড় ভালো না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সে-কথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই-ই তাহলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।

দেখ বিষ্ণু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।

এই বলতে বলতে দুজনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেল। নিরাপদ খিদে-তেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে করতে দুজনে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল।

যত লড়াই-ই হোক একসময় তা শেষ হয়। এটাও হল। আধ ঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোক ছেঁড়া চুল, ফোলা চোখ, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যে-যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল-ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস। এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, কর্তাবাবু, আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।

পশুপতি ফের হুংকার দেয়, মিথ্যে কথা! পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চোখে দেখা।

এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।

এবার আরও বড়ো মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য-দানবের মতো। তারা বড়ো বড়ো সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে কাঁপতে দরজায় খিল তুলে ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি-একুশ বছরের রোগভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য-দানবের মতো পাইককে দমাদম লাঠিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে। কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারো মাথা ফাটছে, কারো কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্তচিৎকার করছে, বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে…!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারি চেনা চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, তুমি কে ভাই?

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, ওঃ, তাহলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়!

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে একটা উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই।

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, বটে? তা, ছোকরাটা কে?

চিনি না।

তুমি না-চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে। তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?

নিরাপদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইক কাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে...

দারোগা হাত তুলে বললেন, আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের ওপরেও হামলা করতে পারো। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।

অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।

থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা গোছের লোক বসেছিলেন। চোখে কুটি, আর খুব রাশভারী মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, স্যার, আপনি এখানে?

হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়োকর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?

দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুণ্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশভারী লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বয়স কত?

ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে, কুড়ি-একুশ হবে।

বলি, পুলিশে চাকরি করবে?

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।

রাশভারী লোকটা বলল, পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, উঁচ পড়লে শোনা যায়।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তাহলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, লে হালুয়া!

নফরগঞ্জের রাস্তা

ও মশাই, নফরগঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারেন?

নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কী! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন-তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড় হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না-হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁ-কে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করেন। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কি! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরে জল যে অতিবিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ-বালাই পালাই পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে-খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন?

কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবে-চিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবে-চিন্তে যাওয়ার কী আছে? মানুষের বাড়িতে কি মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না-হলে কী কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপনি কি বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সে-কথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেট-পাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।

আসলে কী জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কী!

মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।

বিপ্লববিহারী, ওরে বাবা!

অমন আঁতকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়? শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এম এস সি পাস করে আরও কী সব পড়াশুনো করেছে। চাকরিও করে ভালো।

তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।

না:, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কী আর শোনার পাত্র? বেশ ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।

তাহলে আর কী করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।

আহা অত তাড়া কীসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শশা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।

না মশাই, না! দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন!

দেরি কীসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।

আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।

নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গোরুবাছুরকে জিগ্যেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ-বারো বছর আগেও কুঞ্জগুণ্ডা দিনে তিনটে খুন না-করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না-করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না-ছিল তার। তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না-পড়লে আর বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে। বাপ মানুষ মারত দা-কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক-পিস্তল দিয়ে।

বলেন কী মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটাকাটা বৈষ্ণব। ভারি নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারি বিনয়ী। আর খুবই সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে-পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে-তেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে-তেষ্টা তো মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কী আর চলে? তা ভাইজির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি কান্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুপ্ত তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু-চার লাখ টাকা হবে না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি। বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু-হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কী! লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

হুঁ:! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না-নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কীসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না-পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হেঃ হেঃ, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কী হয়। বিয়ের পর

দেখবেন নানা ছুতোয় হরেক রকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে বড়োই টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কী করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড় মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি!

তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন।

আহা, শুনে বড়ো স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন,

তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন-খন। পাবদামাছের ঝাল, সরপুঁটির সরষে ভাপা, রুইমাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অনুগ্রহণ না-করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কী? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কী আর আমাকে আস্ত রাখবে। বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কী, উত্তেজিত না-হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কী, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাত ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কী মশাই। এরপরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুণ্ডার বউ কুসুম তো ভারি লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ। এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে! বিয়ে হলে আপনার ভাইজি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষন্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এম এস সি ফাস্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এম বিএ। স্বভাবও ভারি ভালো। ভারি বিনয়ী, ভারি ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষন্ডাগুণ্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।

এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।

উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।

কুঞ্জগুণ্ডার আরও গুণ আছে নাকি?

তা আর নেই। জীবনে কখনো এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তবিলে নেই। গরিবদুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চারখানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।

তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ। খুন-টুন করেন।

আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কী।

না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না-হলেই নয়।

আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর বাড়িতে বসে আছেন।

এসব কী বলছেন! কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কী?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কীরকম?

এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।

তাহলে?

আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে! সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু-মাইল কম পড়ত।

তাহলে এবাড়ি-?

আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।

অ। তাই বলুন।

নয়নচাঁদ

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নচাঁদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা! আর দুশ্চিন্তা থাকলেই অনিদ্রা। অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়, সুতরাং টাকা থেকেও নয়নচাঁদের সুখ নেই। সারাবছর কবরেজি পাঁচন, হোমিওপ্যাথির গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুঁটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনোমতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানারকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়য় আরশোলা খরখর করে, কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ায় কাগজ ওড়ে, আরও কত কী। তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে। হয়েছিল শব্দটা হল জানলায়। জানালার শিক-এ যেন টুং করে কেউ একটা ঢিল মেরেছিল।

বিছানার মাথার দিকে জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড়ো বাতিটা জ্বেলে মোড়কটা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা: নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিলে। শেষ অবধি গলায় গামছা বেঁধে আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে-পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায় ঘাড় মটকাবো। ততদিন ভালোমন্দ খেয়ে নাও। ফুর্তি করো, গাও, নাচো, হাসো। বেশিদিন তো আর নয়-ইতি-তোমার যম, জনার্দন।

নয়নচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যান্ডনোট লিখে নয়নচাঁদের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করত। কখনো টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপাড়ে এক জঙ্গলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচা-গলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে, তা অবশ্য নয়নচাঁদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন-চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তা ছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে, তিনি জল খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে পারল না। এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা-গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হল। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন না। তাঁর সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনো বাড়িতে গেলে তিনি ককনো সদর দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমনকী, খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমনকী জানলা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নচাঁদের বাড়িতে বরদা ঢুকলেন টারজানের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের একটা ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে, বরদা পাশের

একটা জামগাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা গাছে। সেখান থেকে নয়নচাঁদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলার জানালায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, এই যে নয়নবাবু, কী হয়েছে বলুন তো?

জানালায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিরমি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হল। বরদাচরণ ততক্ষণ ধৈর্যের সঙ্গে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নচাঁদ, তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, তাহলে এই জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলেবাঁধা চিঠিটা ছোঁড়া হয়েছিল তো?

হ্যাঁ বাবা বরদা।

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।

না। খামোকা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো-হাওয়া আসবে না করালেও আসবে। ঝুটমুট খরচ করতে যাব কেন?

তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?

কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবি বলতে পারো।

কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?

কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই, তাই খেয়েছি। দু-খানা রুটি আর কুমড়োর হেঁচকি।

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি খুবই কৃপণ। ভীষণ কৃপণ।

না বাবা, কৃপণ নই। হিসেবি বলতে পারো।

আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে!

নয়নচাঁদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরতে তাঁর বেশ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, কৃপণ বা হিসেবি বললে আপনাকে কিছুই বলা হয় নাঃ আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?

আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশি নয়?

কিছু কমই হবে বাবা। হিসেব করে দেখছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশো টাকার বেশি নয়।

তবে আমি চললুম, ভিজিট বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, যেও না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবোখন।

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, চিঠিটা দেখি।

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতসকাঁচ দিয়ে অক্ষরগুলি দেখলেন ভালো করে। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, এটা কি জনার্দনেরই হাতের লেখা?

ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যাঁণ্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

বরদা বললে, হু, মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেকসই ছিল না।

তার মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?

গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফাঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে, গামছা ছিঁড়ে সে পড়ে যায় এবং বেঁচেও যায়। এই চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে তো, বিপদের কথা। আপনি বরং কটা দিন একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও করে নিন প্রাণভরে।

তাঁর অর্থ কী বাবা! কী বলছ সব? আমি জীবনে কখনো ফুর্তি করিনি। তা জানো?

জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভালো? অমাবস্যার তো আর দেরিও নেই!

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, জনার্দন যে মরেছে, তার সাক্ষীসাবুদ আছে। লাশটা শনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।

তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে, তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।

নয়নচাঁদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে উঠে বললেন, প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বলো তাই করি।

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে দেখছি।

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিনদিন পর। মাথার চুল উসকোখুসকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন, পেয়েছি।

নয়নচাঁদ আশান্বিত হয়ে বললেন, পেরেছ ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, তাকে ধরা অত সোজা নয়। তবে জনার্দনের বউ-ছেলেমেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরের একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে, পরের বাড়িতে ঝি চাকর খেটে কোনোরকমে বেঁচে আছে।

অ, কিন্তু সে খবরে আমাদের কাজ কী?

বরদা কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন চিঠিটা যদি ভালো করে পড়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ-ছেলেমেয়ের ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।

তা বটে।

যদি বাঁচতে চান তো, আগে তাদের ব্যবস্থা করুন।

কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?

তাদের বাড়িঘর ফিরিয়ে দিন! আর যা সব ক্রোক করেছিলেন, তাও।

ওরে বাবা? তার চেয়ে যে মরাই ভালো।

আপনি চ্যাম্পিয়ন।

কীসে বাবা বরদা?

কিপটেমিতে। আচ্ছা আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।

দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে?

মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, তাহলে তাই হবে বাবা।

অমাবস্যার আর দেরি নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলি বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, আজ রাতে রুটির বদলে ভালো করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।

বলো কী?

যা বলছি, তাই করতে হবে। আপনার প্রেশার খুব লো। শক-টক খেলে মরে যাবেন।

তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেয়ে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

এই যে নয়নচাঁদবাবু কেমন লাগছে?

গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।

আপনার কাছারিঘরে বসে কাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না।

বলো কী বাবা বরদা? এরপর আমিই পথে বসব।

প্রাণটা তো আগে।

কী আর করেন, নয়নচাঁদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন, তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হল রাতে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধেবেলা বরদা এসে বললেন, কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো!

ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা!

ভয় পাবেন না। আজ রাত্রে আরও দুখানা পরোটা বেশি খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে, কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে?

নয়নচাঁদ হাঁপ-ছাড়া গলায় বললেন, তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে, এই বাড়িতে কখনো ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়নচাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শয়ে-শয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর ব্যাজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে ভাঙিয়ে আনালেন। ভিখিরিরা যখন বিদেয় নিল, তখন নয়নচাঁদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা।

দুপুরে একরকম উপোস করেই কাটালেন নয়নচাঁদ। টাকার শোক তো কম নয়!

নিজের ঘরে শুয়ে থেকে একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল, তখন চারিদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলোও দিয়ে যায়নি।

আতঙ্কে অস্থির নয়নচাঁদ চেঁচালেন, ওরে কে আছিস?

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নচাঁদের! বুকটা ছমছম। চারদিকে কীসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্যে। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নচাঁদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে পেয়ে গিয়ে বললেন, কেন রে ভূতের পো, আর কোন পাপটা আছে আমার শুনি! আর কোন কর্মফল বাকি আছে? থোড়াই পরোয়া করি তোর?

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ। জানালার বাইরে থেকে বরদাচরণ বললেন, ঠিকই বলছেন নয়নবাবু। আপনার আর পাপটাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে না। অমাবস্যা একটু আগেই ছেড়ে গেছে।

বটে?

তবে ফের অমাবস্যা আসতে আর কতক্ষণ? এবার থেকে যেমন চালাচ্ছেন, তেমনি চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেট খাওয়া, বিকেলে দানধ্যান সৎ চিন্তা, রাত্রে পরোয়া, মনে থাকবে?

নয়নচাঁদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, থাকবে বাবা, থাকবে।

পুরোনো জিনিস

মদনবাবুর একটা নেশা, পুরোনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তাঁর টাকারও অভাব নেই, বিয়ে-টিয়ে করেননি বলে এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরোনো রাঁধুনি বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট-ঝামেলা নেই, কোথাও পুরোনো জিনিস, কিম্ভুত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোঁচ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি। ইঁদুর, আরশোলা উইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাঁক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট-পালং, ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার, দোয়াতদানি, নস্যির ডিবে, কলম ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তাঁর সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরোনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি-দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে-বাড়িটা আজও টিকে আছে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো-পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল কারণ জন ম্যাকফারলনেরও পুরোনো জিনিস কেনার বাতিক ছিল। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তাঁর জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই

বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, উটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।

মদনবাবু তাঁর বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, ওরে ভজা, আমি চললুম। দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেসে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।

ভজা মাথা নেড়ে বলে, নতুন নয় পুরোনো।

ওই হল। আর রাঁধুনিকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যারফারলনের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশিরভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরোনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তাঁর কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনো জিনিসে হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর-ওঘর ঢুকে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটোখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমশিম খেতে লাগলেন।

বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে আর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগিনির পালঙ্ক দশহাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এছাড়া মুক্তোমালার দাম উঠল চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষদিকে একটা পুরোনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়োসড়ো এবং সাদামাটা। আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কবজা করার জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

অমনি পাশ থেকে কে যেন ডেকে দিল, কুড়ি হাজার।

মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই না। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি? নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু না নিয়ে যেতে পারলে নিজের কাছেই যেন নিজে মুখ দেখাতে পারবে না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, একুশ হাজার।

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে-মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তরদিকের জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারি জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু।

নীচে আর ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডরোভ। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা, বর্মা-সেগুন কাঠের তৈরি ভালো জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তার আর কী করা! এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে-মাঝে ঠকতেই হয়।

একুশ হাজার টাকা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীর রাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন। বুড়ো তাঁকে বলছে, তুমি মোটেই ঠকোনি হে, বরং জিতেছ।

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু মাথা নেড়ে বলল, না-না আমার তা মনে হয় না! আমার তা মনে হয় না…

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজ ঘুম ভাঙল। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর-খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরোনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, দয়া করে বাতি জ্বালাবে না, আমার অসুবিধে হবে।

মদনবাবু ভারি রেগে গেলেন, টর্চের সুইচ টিপে বললেন, আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে! কে হে তুমি?

চোরটা যে কে বা কেমন লোক তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর ঝাঁকালেন, নাড়লেন, উলটে-পালটে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি!

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে, তাঁর গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, শিগগির বেরও বলছি, নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলবার আছে।

নেই।

কে বলল নেই?

জানি কি না।

কিন্তু লাঠি আছে।

খুঁজে পাবেন না।

কে বলল খুঁজে পাব না?

অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কি সোজা?

আমার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর, এক ঘুষিতে নারকেল ফাটাতে পারি।

কোনোদিন ফাটাননি।

কে বলল ফাটাইনি।

জানি কিনা। আপনার গায়ে তেমন জোরও নেই।

আমি লোক ডাকি, দাঁড়াও।

কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?

চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এ-ঘরে, আর এই ঘরেই কিনা চোর!

চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।

তার মানে?

কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। দুরুদুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লক হলঘরে দিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দুজন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কি দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে খুশি-খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম হল না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে একটু তন্দ্রা মতো এল। হঠাৎ হলঘরে আগের রাতের মতো শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে ঢুকে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

কে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন।

মদনবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তোমরা কারা বাবারা?

সে কথা শুনলে আপনি ভয় পাবেন।

ইয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা, এসব কী হচ্ছে, একটু জানতে পারি না।

খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।

তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পড়ি। তোমরা কি চোর?

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, কাল থেকে চোর-চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।

তবে?

আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা-চামুন্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।

আলমারি?

আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক না কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই–

তাই কি?

তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।

মদনবাবু বেশ খুশিই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, কিন্তু বাবারা, দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।

মেলা ফ্যাচফ্যাচ না করে, যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক-ফিচিক হাসতে গেলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা তিনতলায় যা ফাঁকা আছে, তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

ভূত ও বিজ্ঞান

সন্ধে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হল আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গন্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে-ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর একটা বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না, সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনো ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ-বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, কে?

কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।

বলো ভায়া।

বলি, তুমি এখন কোথায়?

আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু-হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখির মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।

বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।

বলো কী? তুমি তো কদিন আগেও হিউস্টনে ছিলে।

তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?

তা নবগ্রামে কী মনে করে?

একটা সমস্যায় পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভালো।

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কোথায় আছ সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি কতে জিরে ইন করো।

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন, নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখির বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হল না। মেঘের বলটা হুড়ম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলি অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু-হুঁ করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও!

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, চোপ।

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলির উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে-ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দুশো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল।

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃৎকম্প হতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হল হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, আ আপনি?

শূন্যে দুখানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, বোসো হে পটল, কথা আছে।

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ার কোনো ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন ভয় পেও না।

আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠাণ্ডাও লাগবে না, পড়েও যাবে না। নীচে এখন প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো–

মারা গেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি,

প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হত। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধারণা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভুত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, ভূত? কিন্তু ভূত তো-

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছ, কোনো স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া-এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, আজ্ঞে না।

তবে? বিজ্ঞান শিখে এসব না-মানার অভ্যাস মোটেই ভালো নয়, বুঝলে।

যে আজ্ঞে।

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন ল্যাবরেটরির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকে তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটরিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছ।

যে আজ্ঞে।

আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

যে আজ্ঞে।

তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটরিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?

খুব খাবে, খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা–

উঁহু, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত-বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে নইলে–

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাত করে বললেন, আজ্ঞে তাই হবে।

তাহলে চল, নামা যাক।

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ-সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, এবার নিজে নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। যে আজ্ঞে, বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড় মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যেসব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু-হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড়ো কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পালটাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচন্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘরসংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমতো বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে নাড়ু খাব, নাড়ু খাব বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড় নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড় ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড়ো ছেলের ছোটো ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন ছেলের

কোন ছেলের কোন ছেলে, বা কোন মেয়ের কোন মেয়ের কোন মেয়ের মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন ছেলের কোন মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কম্পিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন।

কাজেই অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে, কোনটা খেতে ভালোবাসে, কোনটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়টে, সবই কম্পিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, মা নাড় হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব? কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড় মেশিনের। বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড় গরম রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!

ভুল হয়ে গেছে মা।

অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়, দেখি, দে তো একটা।

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।

আচ্ছা মা। বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটা কাশির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসংকোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, আবার এ-ঘরে ছোঁক ছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বলেন, ছোঁক ছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে প্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মারমার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, ওরে বাবুকে কয়েকখানা নাড় দে তো।

না পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু-খানা দু-গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন ওরে ও খেদি, শুনতে পাচ্ছিস?

যাই মা। বলে সাড়া দেয় একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি!

খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।

তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খনিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড় খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, নাড়গুলো খাসা হয়েছে।

বাসবললিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণমেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, দক্ষিণমেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?

কেন কী হয়েছে?

সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।

তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়!

দিচ্ছি মা।

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রে-টা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড় গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে আসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না-শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশগুণ বাড়িয়ে দেবে, পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তমহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কম্পিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড় যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপরে-নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানলার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছে-গুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না-কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাবল বা বুদবুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাঁপটা লাগতে দেয় না।

বুদবুদ বন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোটো ছোটো ট্যাবলেট বা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনো ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাথ। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলেই জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছোলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে-যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকার হয় না। শূন্যে নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনো বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোটো-ছোটো ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনো অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারেজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোটো আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদবুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড়ো বড়ো উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনো পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়গাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর একসময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম-জাম-কাঁঠাল কিছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের, কোনো অসুবিধেই হত না। এই বড়ি বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড়ো কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেবখন।

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।

কেন রে কী হল?

আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিয়োতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, বলিস কী! এতো সব্বোনেশে কান্ড।

রেমো একটু হেসে বলল, তোমরা পুরোনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনো খবরই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার দাবারে বিষটিস মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিন্ডটা কলের না-হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, তা এইসব কান্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়া খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কবজায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতি ভাই, তলায় তলায় সকলে সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যাণ্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?

না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।

যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই। রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখন বড় পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অক্সিজেন-রুমাল মাঝে মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না-করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায়

বলেছিলেন, ফের কভি বিড়ি ফুকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেয়া যে, আক্কেল গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?

গঙ্গারাম একটু বোকা গোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনো নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, শোনো, এখন চাকরবাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পালটে গেছে।

আশুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, আঃ আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যেসব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না-হয়ে বললেন, শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যাণ্ড চাইছে। এরপর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তাহলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, কী ওষুধ?

আশুবাবু খুব হেঁহে করে হেসে বললেন, আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।

বলো কী? চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।

দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না। তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।

না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।

জিনিসটা কী?

দেখলেই বুঝবে।

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া... ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, উঃ মা গো, এ আবার কে? আশুবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু লোকটা আসলে কে?

একথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। একেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখাসাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলুম, হচ্ছিল না, তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, আর ভয় নেই গিন্নি

ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদের ঢিট করবে ওরাই।

কেলে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, এজ্ঞে, একেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব, কোনো চিন্তা করবেন না।

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেঁচে থাকো বাবারা।

মাঝি

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড়ো অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মন্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড়োসাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড়ো দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড়ো বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মন্ডল বলল, পৌঁছতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, না, আজই পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ আর দিনু মন্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এরপর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু-পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছানোর কথা, পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনো লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে দুজনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম গন্ধ নেই। নদীতে বড়ো বড়ো সাংঘাতিক ঢেউ উঠেছে। বাতাসের বেগও প্রচন্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার পথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মন্ডল বলল, চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।

জয়চাঁদ রাজি হল না। বলল, তুমি যাও দিনু দাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিনহাত যেতে-না-যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।

দিনু মন্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনো মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি-বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসেব তার মাথা থেকে থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়-বৃষ্টি একসময়ে প্রচন্ড বেড়ে উঠল। এমন সাংঘাতিক যে জয়চাঁদ দুবার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে-কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ-সাত হাত উঁচু বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছলে আরও পাঁচ-সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীর ভাবে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনো ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভালো করে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনোরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখার মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড়ো দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড় জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকাটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন-ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে-হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাক কিছুক্ষণ দলাই-মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, কে বটে তুমি?

আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, ও বড্ড ফাড়া গেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, যাবো ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।

লোকটা বলল, হু। কেমন অসুখ?

ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কিনা কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাব কিনা বুঝতে পারছি না।

লোকটা বলল, মেয়েকে বড্ড ভালোবাসো, না?

তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, চলো তাহলে।

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

তোমাকে পৌঁছে দিই।

খেপেছেন নাকি? কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকা বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাত। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকায় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।

লোকটার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকার খোল থেকে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকাটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বৈঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝ দরিয়ায় জলের প্রচন্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দুহাতে শক্ত করে নৌকার দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বৈঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকাটাকে তীরগতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ-দিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, জয়চাঁদ, ভয় পেও না।

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার মান তো এর জানার কথা নয়।

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকাটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছের দিকে চেয়ে বলল, কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকায় আনন্দপুর আসতে তো সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগে।

ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, না। ঝড় তো উলটোদিকে। যা হোক, পৌঁছে তো গেছ।

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, আপনি কে?

আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?

বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, কিরো কী জয়চাঁদ, করো কী? বাড়ি যাও জয়চাঁদ।

গিয়ে?

মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে? বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর, উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোটো ডিঙিটা নিয়ে কোথায় যে চলে গেল কে জানে?

লালটেম

লালটেম কারও পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকালবেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। একদিকে বেঁটে-বেঁটে চা-বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড়ো একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠাণ্ডা জলের পাহাড়ি নদী-তাতে সবসময়ে নুড়ি-পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে-সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়-সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা। আর সন্ধের মুখে-মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনার রং ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘ-বৃষ্টি-রোদ আর হাওয়ার খেলা। গাছে-গাছে পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে-দেখতে আর থমকে-থমকে থেমে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে। মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গীসাথি কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ, গোরু বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর-চোর খেলে, ডান্ডাগুলি খেলে; নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরও কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়।

কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না, সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গোছের পাকা ডুমুর কি আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময়ে বেল পাড়ে, কখনো বা টক আম বা বাতাবি লেবু পেয়ে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ মহারাজার পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট্ট ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝোঁপড়া। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড়ো-বড়ো কারবারিদের কাছে ভৈসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি। তিনটে মোষের মধ্যে দুটো মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। দুটো মেয়ে-মোষই বছরের কোনো-না-কোনো সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোেষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়ো। মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাবা দুধ, পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনোরকমে দশজনের সংসার চলে। লালটেমদের দাদু আছে, আরও ছয় ভাইবোন আছে। তারা কোনে লেখাপড়া শেখেনি, মাঝে মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেড়া ছাড়া কোনো ভালো খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভালো জামাকাপড় পরেনি, তারা একসঙ্গে এক-শো টাকাও কখনো চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারো পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথিদের সঙ্গে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ-বাতাস-আলো-পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটি রোগা মানুষ ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার ময়লা চাদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুটুলি। লালটেম আর তার সাথিরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। কারণ, নদীর ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গন্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তির-ধনুক থাকে আর কুড়ল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটা মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, একটা জিনিস দেখবে?

হ্যাঁ-অ্যাঁ–লালটেমরা খুব রাজি।

লোকটা ধীরে-আস্তে পুটলির গিট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইট।

তারা সমস্বরে বলে ওঠে, এ তো ইট!

রোগা লোকটা হেসে বলল, ইট ঠিকই, তবে সাধারণ ইট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ওই জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন। তাঁর রানি যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইটগুলো পুঁটলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নীচে পোঁতা আছে। যে পাবে, সে এক লাফে বড়োলোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে। চারদিকে যাওয়া শক্ত।

লালটেম বলে, তুমি তাহলে বড়োলোক হলে না কেন?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, আমি! আমি বড়োলোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। দিব্যি আছি, ঘুরে-ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।

লালটেম বলে, তোমাকে বাঘে ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?

লোকটা ভালোমানুষের মতো বলে, জানোয়ারেরাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।

লোকটা তারপর গান গাইতে-গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথিদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল-গাঁইতি হাতে কয়েকজন লোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুন্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, এই ছোঁড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?

লালটেম ভালোমানুষের মতো বলে, কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে।

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, আমরা যে এদিকে এসেছি, খবরদার কাউকে বলবি না।

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ-তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল-শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিগ্যেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল, তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা-খোঁড়া-বুড়ো-কচি-বড়োলোক-গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে ভারি অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমার ফিরতে দুদিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো। বাড়ি-বাড়ি দুধ দিও পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি করো।

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পর একদল খুঁটেউলির সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দুদিন। তুমি সব সামলে রেখো।

সেই রোগা লোকটা গ্রামে-গঞ্জে হাটে বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষেরা চলেছে সেই রাজবাড়ির খোঁজে! লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দুদিন গেল। তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথিরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ মা, আপনজনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনো ফেরেনি!

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে। গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফলপাকুড় খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ, পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে খিদেয়, ভালো করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর মকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজছি। খাবার নেই, জল নেই।

সারা পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেছে!

এইরকম ভাবে দু-চার দিন ধরে একটি-দুটি হা-ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহু লোক বাঘের পেটে গেছে। কিছু

মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা-ভরতি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকিভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর বিড়বিড় বকছে, রাজবাড়ি? সোনা-দানা! বাপ রে বাপ!

এর দুদিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল তার মা এ কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গেছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল পেকে শনের গুছি, গলার স্বরে একটা কাঁপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে-একে সবাই ফিরে এসেছে। মরেনি কেউ। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে-মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গেছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে-চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে রাজবাড়ির জন্য লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে-খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে-ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটেম ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে।

আর চিকড়ি মিকড়ি আলোছায়ায়, সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙেপড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরি, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনও একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম অবাক হয়ে চেয়ে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি মনে হচ্ছে! এক-পা দু-পা করে লালটেম এগোয়।

চারিদিকে শ্যাওলা ধরা পাথর আর ইটের স্তূপ। এই সেই ইট যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে, চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলছে। ফোঁ ফোঁ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হি: হি: করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে আছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়শার জাল এত ধারালো যে, গায়ে লাগলে, চামড়া চিরে যায়। কাঁকড়া বিছেরা বাসা করে আছে যেখানে-সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জং ধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াত করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা-রুপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার-হাজার মোহর দেখতে পেল। তার পাশেরটায় গহনা, হিরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক! সবকিছু সে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস, সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব-শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে, ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল! ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে কঙ্কালটা বলল, লালটেম, যেও না।

লালটেম ভয় পেয়েও দাঁড়াল।

একবোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে-আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে। লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথার খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, আমার দশা দেখেছ?

দেখছি।

ভয় পেও না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর-গয়না, এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, নিয়ে কী হবে?

অভাব থাকবে না। খুব বড়োলোক হয়ে যাবে। নাও।

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল, হাংগা।

লালটেম চমকে উঠে বলল, আমার মোষটার জল তেষ্টা পেয়েছে। আমি যাই।

যেও না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।

মহারাজা আবার ডাকে, আঃ-আঃ।

লালটেম ছটফট করে বলে, বেলা বয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।

তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে। তখন বড়ো দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়োলোক হয়ে যাও।

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায় গাঁ...গাঁ।

লালটেম একটু হেসে বলে, আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, গাঁ-গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজে-খুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়োলোক হবে না?

লালটেম একটু ভেবে বলে, না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি! সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। উঃ করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, গত এক-শো বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ।...ইঃ, ওই দেখ, মাথায় ফের কাঁকড়াবিছেটা হুল দিল...কী যন্ত্রণা!...আচ্ছা লালটেম, বল তো, বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে তবু খুঁজে পায় না কেন? আর যে দু-একজন খুঁজে পায়, সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও, তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?

বাইরে মহারাজা ভীষর রেগে চেঁচায়, গাঁ-অ্যাঁ।

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে থাকে। সাথিদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল নদী, মাঠ, চা-বাগান দেখে তার ভারি আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে।

কোনোদিন তার খাবার থাকে। কোনোদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভালো আছে। তার কোনো দুঃখ নেই।

লোকটা

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলার বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান, সেখানে খেলা করছে তাঁর সাতটা ভয়ংকর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালি দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদাসতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু এরকম সুরক্ষিত থাকতেই ভালোবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হিরে-জহরত, সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হল। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমতো টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ক্ষেপও করল না। পাথরকুচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুরেরাও যেমন খেলছিল তেমনিই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভালোমানুষিও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনও দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?

লোকটা জবাবে পালটা একটা প্রশ্ন করল, আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, না, তো-ইয়ে-মানে আপনি কে বলুন তো?

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, আমার, খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।

লোকটার বাঁ-কবজিতে একটা অদ্ভুত দর্শন ঘড়ি। বেশ বড়ো এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোটো ছোটো ডায়াল ও কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটা গলা খাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। তার উপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন এটাই বা কেমন কথা?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?

আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।

আমিও খিদে পেলে খাই। এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বললেন, আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললেন, আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কী করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনো লোক কখনও খবর না-দিয়ে ঢুকতে পারে না।

লোকটা ভালোমানুষের মত মুখ করে বলে, সে-কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুরেরা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু-চারটে কথা বলা যেত।

এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই, আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।

সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত-সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।

সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কী। ওই যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যাথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।

সোমনাথবাবু এও বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখন গলায় ভালো করে স্বর ফুটছে না, আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন? ভাবই বা হল কী করে?

লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু-

পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললে নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?

সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হল যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, কিন্তু ভাব করলেন কী করে?

ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে! সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতোই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানি লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।

সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, মানে-ইয়ে যাকগে, আমার এখন আর কোনো বিরূপ ভাব নেই।

আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।

শশব্যস্তে সোমনাথবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।

লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, আর সময় নেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন?

বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।

গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি। লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস! ফস করে ঢুকতে দিলে যে বড়ো!

বাহাদুর তার ছোটো চোখ দুটো যথাসম্ভব বড়ো বড়ো করে বলল, কেউ তো আসেনি বাবু।

আলবাত এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।

বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুকলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হল নাকি?

সোমনাথবাবু তাঁর কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টু শব্দটিও করলি না!

কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তাঁর সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজী হয়ে উঠতে লেগেছে।

একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুরেরাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, এই যে! কী খবর?

আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?

তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান ভুল দেখে, কুকুরেরাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকছে না।

লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

সোমনাথবাবু একথা শুনে একেবারে বুরবক, তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?

লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু-লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশো পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও আছে।

উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, কোথায় মিল মশাই? কীসের মিল? লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড়ো খিদে পেয়েছে।

সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, খিদে পেয়েছে তো হোটেলে গেলেই হয়। লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার কাছে পয়সা নেই যে!

পয়সা নেই! এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, এ জিনিস এখানে চলবে?

তার মানে?

আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শো টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন!

সোমনাথবাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হল? এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।

লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, সব কথারই জবাব দেব। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।

সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ।

সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, শুধু খ! এরকম নাম হয় নাকি?

আমাদের ওখানে হয়।

আর পদবী?

খ মানেই নাম আর পদবী। খ হল নাম আর অ হল পদবী। দুয়ে মিলেই ওই খ।

ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।

আমাদের সবই ওরকম।

তা আপনার বাড়ি কোথায়?

একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।

আল! আল আবার কী জিনিস?

ওটা হল দূরত্বের মাপ।

এরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইল খানেক হবে নাকি?

লোকটা হাসল, একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।

না না, থাক।

লোকটা অভিমানী মুখে বলে, আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভালো লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনো বদ মতলব নেই।

সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে না না। ঠিক আছে, বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এসময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।

তাই হবে চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।

মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।

আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।

কৌতূহলী সোমনাথবাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।

কোথায় আপনার গাড়ি মশাই? বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, আহা, যাবেন না, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।

বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড়ো জিনিস, একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নীচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।

এটা আবার কী জিনিস?

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি। লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক।

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, ভূ-ভূত! ভূ-ভূতুড়ে!...

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না মশাই না। ভূতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না- রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনো ভয় নেই।

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ও বাবা, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাব না।

লোকটা করুণ মুখে বলে কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, খারাপ নন, তবে ভয়ংকর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।

আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু-হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড়ো গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার চারদিকে দেড় হাজার ছোটো-বড়ো গ্রহ আছে। সব কটা গ্রহই বাসযোগ্য। আপনাদের মতো মোটে একটা গ্রহে প্রাণী নয় সেখানে। সব কটা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনো কোনো গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে, কোনোটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ, কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনো গ্রহে ঘোর কলি, কোনোটাতে সত্য, কোনোটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর-সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।

ওরে বাবারে! বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হল। যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডায়নোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথ। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। দু-চারটে তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভালো। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দুজনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?

সব সত্যি। আরও আছে।

আমি আর দেখব না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

লোকটা বিনীতভাবে বলল, যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।

মহাকাশযানটা ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা-টরোটা যেন পাই। হবে, হবে। বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

শিবেনবাবু ভালো আছেন তো

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুল পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভালো নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন

যদি তারা ফিরে আসে! বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে-দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক তাকে ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে পিঠে ছোরা।

রিভলভারওলা বলল, যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের টাকা নিয়ে তোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনওরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হল যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়ে নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে তোক ঘিরে ধরল তাকে। বুকে-পিঠে-পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভলভার আর ছেরো ধরল। একই কথা বলল, এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হল।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভালো করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে অকাশের দিকের চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হল, তারপর বলল, হবি, হবি। হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাত্রে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।

তার মানে?

কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চিনেম্যান চাঁই ছুঁই।

আ-আপনি কোথায়? দে-দেখতে পাচ্ছি না তো!

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারেকাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছ কি কখনও?

আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

আ মোলো! এ যে ভালো করতে এসে বিপদ হল।

আ-আপনি কী চান?

তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে।

কিন্তু বিধি বাম সে উপায় নেই।

আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?

রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন-তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছ কি? কিছু করতে পারলে?

আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।

আর তোমার বুঝি কিছু নেই?

আজ্ঞে না।

কে বলল, নেই?

ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোটো লাঠি আছে।

আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি-লাঠির কথা জিজ্ঞেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?

আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার একটা গাদা বন্ধুক ছিল।

গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক-টক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আজ্ঞে না।

বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!

জানি।

তোমার সেটাও নেই?

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হল। তারপর গলার স্বরটা বলল, শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলি তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি-হাসি মুখ করে শুধু জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!

শুধু এই কথা বললেই হবে?

বলেই দেখো না।

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবারপয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে-কথাটা বলতে হবে তা বারবার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত-পা-কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

জীবনে কোনোও সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো?

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়োবাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশিট দেন আর কী। হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন, যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধোনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো৷ গিন্নি একেবারে জল।

হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভালো আছেন। কোনও উদবেগ, অশান্তি নেই, বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

শিবেনবাবুর ইস্কুল

সকালে বেড়াতে বেরিয়ে মহেন্দ্রবাবু একটা ভাঙা পরিত্যক্ত ইস্কুলবাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্কুলবাড়ি দেখলেই চেনা যায়। লম্বামতো বাড়ি, সার সার ঘর, মাঝখানে একটা উঠানমতো। তিনি ত্রিশ বছর নানা ইস্কুলে পড়িয়েছেন। এই সবে রিটায়ার করে হরিপুরে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে এসেছেন।

একটা লোক সামনের মাঠে খোঁটা পুঁতছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাপু হে, এটা যেন স্কুলবাড়ি বলে মনে হচ্ছে, তা এর এরকম ভগ্নদশা কেন?

ভগ্নদশা ছাড়া উপায় কী বলুন! শিবেন রায় ইস্কুল খুলেছিলেন, কিন্তু মোটে ছাত্তরই হয় না, তাই উঠে গেছে।

বল কী? তা ছাত্র হয় না কেন?

অ্যাজ্ঞে এ হল গরিবের গাঁ, ছেলেপুলেদেরও পেটভাতের জোগাড় করতে কাজে লেগে পড়তে হয়, পড়বার ফুরসত কোথায় বলুন?

তাহলে তো বড়োই মুশকিল, এক কাজ করলে হয় না? যদি বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে ক্লাস করা হয় তাহলে?

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, তার জো নেই কর্তা, কেরোসিনের যা দাম হয়েছে তা কহতব্য নয়, শুধু দামই নয়, মাথা খুঁড়লেও তেল পাওয়া যায় না এখানে। তাই সন্ধ্যে হতে না হতেই গোটা গাঁ ঘুমে একেবারে ঢলাঢ়ল, সন্ধ্যের পর এ গাঁয়ে আলোর ব্যবস্থাই নেই, অন্ধকারে কি লেখাপড়া হয়?

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, শিক্ষা জিনিসটা মানুষের জীবনে কত প্রয়োজন তা তিনি ভালোই জানেন, তাই বললেন, কিন্তু বাপু হে, শিক্ষারও তো একটা দাম আছে।

লোকটা একগাল হেসে বলে, তা আর নেই! শিক্ষা বড় উপকারী জিনিস মশাই, দু-চারটে ইংরিজি বুকনি ঝাড়লেই আমি দেখেছি গা বেশ গরম হয়ে ওঠে। শীতকালেও ঘামের ভাব হয়। তারপর ধরুন ইতিহাস, দু-পাতা পড়লেই এমন চমৎকার ঘুম এসে যায় যে, এক ঘুমে রাত কাবার, অঙ্ক কষতে বসলে খিদে চাগাড় দেবেই কী দেবে, একথালা পান্ত খেয়ে আঁক কষতে বসেই খিদের চোটে উঠে পড়তে হয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু একটু হতাশ হলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য হারালেন না, বললেন তা বাপু, ইস্কুলটা চালু করার একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলে, শিবেনবাবু পটোল তুলেছেন। তার ছেলেমেয়েরা ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে ভারি ব্যস্ত। ইস্কুলের পিছনে কে টাকা ঢালবে বলুন? ছাত্তরও নেই।

তাই তো! বড়ো সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।

মহেন্দ্রবাবুর খুড়শ্বশুর পাঁচকড়ি সমাদ্দার বললেন, শিবেনবাবুর ইস্কুলের কথা বলছ নাকি বাবাজি? ও তো এখন সাপখোপের আড্ডা, শিবেনবাবু ভালো ভেবে ইস্কুল তৈরি করলেন বটে, কিন্তু চালাতে পারলেন কই? আর এ গাঁয়ের লোকের লেখাপড়া শেখার গরজও নেই, শুনছি শিবেন্দুবাবুর ছেলেরা ইস্কুলবাড়িতে গুদামঘর বানাবে।

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, দমলেন না, পরদিনই গিয়ে শিবেনবাবুর বড়ো ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করে বললেন, স্কুলটা আবার চালু করলে ভালো হয়।

গোবিন্দ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ট্যাঁকের কড়ি আর কতকাল গচ্চা দিতে হবে বলুন তো? বাবা তো কম টাকা ঢালেননি, আজ অবধি ক-টা মাধ্যমিক টপকেছে তা জানেন? পঞ্চাশ জনও নয়, আর তা না-হবেই বা কেন? যা ভূতের উৎপাত!

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বলে, ভূতের উৎপাত? সে আবার কী?

তবে আর বলছি কী? দিনেদুপুরে খাতা পেনসিল টেনে নিয়ে যায়, চেয়ার-টেবিল উলটে দেয়, ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেয়, পরীক্ষার সময় ক্যানেস্তারার শব্দ করে, ইট-পাটকেল ছোড়ে, সবাই জেরবার হওয়ার জোগাড়।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ভূত একটা কুসংস্কার বই তো নয়, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু লোক আড়াল থেকে এসব করাচ্ছে।

গোবিন্দ বলল, তা পটল ঘোষ দুষ্টু নয়, এ কথা কেউ বলেছে কি? হাড়েবজ্জাত মানুষ ছিল মশাই, গাঁয়ে কোনো ভালো কাজ হতে গেলেই বাগড়া দিত, নতুন রাস্তা হয়েছে, পটল দলবল নিয়ে রাতে এসে রাস্তা খুঁড়ে রেখে যেত। জলাশয় হচ্ছে, পটল গিয়ে রাতারাতি তাতে ঢেলে রেখে আসত, গাছের চারা লাগালে উপড়ে ফেলতে লহমাও সময় লাগত না তার। পটলের আমলে এ গাঁয়ে একটাও স্কুল হয়নি, হলেই মামলা ঠুকে, মিথ্যে নালিশ করে কাজ আটকে দিত।

তা সেই পটলবাবু কোথায় থাকেন?

তা কে জানে মশাই, তবে কয়েক বছর হল সে মারা গেছে, ভেবেছিলাম এবার গাঁ জুড়োবে, তা কোথায় কি, ভূত হয়ে এখন আমাদের ইস্কুলটার পিছনে লেগেছে, আমাদেরই কপাল খারাপ, ওই জায়গাটাই পটলের ভিটে ছিল কিনা, বাবা জমিটা কিনে নিয়েছিলেন।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে মহেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন, সব শুনে পাঁচকড়ি বললেন বাবাজীবন, গোবিন্দ কিন্তু মিথ্যে কথা বলেননি, এ ওই পটলের ভূতই বটে, তুমি বিশ্বাস করবে না বলে বলিনি, কিন্তু ঘটনা খুব সত্যি ।

মহেন্দ্রবাবু জেদি লোক, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু মটকা মেরে রইলেন, বাড়ির সবাই ঘুমোলে চুপি চুপি উঠে, খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়লেন, তারপর সোজা এসে পোড়ো ইস্কুলবাড়িটায় ঢুকে পড়লেন।

ভূতের মোকাবিলা কখনও করেননি বলে মহেন্দ্রবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এমতাবস্থায় কী করা উচিত। তবে তাঁর অসম্ভব সাহস, বুদ্ধিও বড়ো কম নয়।

সামনে যে ক্লাসঘরটা দেখলেন সেটাতেই ঢুকে পড়লেন মহেন্দ্রবাবু, ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, ইঁদুরের কিচমিচ শোনা যাচ্ছে, ঝিঁঝি ডাকছে, চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু মাথায়, মুখে, হাতে মাকড়সার জাল টের পাচ্ছেন, চারদিকে বিচ্ছিরি গন্ধ।

মহেন্দ্রবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীরভাবে ডাকলেন, পটলবাবু–

কেউ জবাব দিল না।

পটলবাবু, শুনতে পাচ্ছেন? কোনো শব্দ নেই?

পটলবাবু, আমি হলাম মহেন্দ্র মাস্টার, বহু গাধা ঠেঙিয়ে মানুষ করে দিয়েছি, বুঝলেন?

অন্ধকারে হঠাৎ সামনে একটা সাদামতো কী যেন দেখা গেল, না কোনো মূর্তিটুর্তি নয়, খানিকটা কুয়াশার মতো ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ একটা খ্যাঁকানো গলায় কে যেন বলে উঠল, কে র‍্যা? কার এত বুকের পাটা যে রাতবিরেতে ডাকাডাকি করছিস?

বললুম তো, মহেন্দ্র মাস্টার, গাধা পিটিয়ে মানুষ বানাই,

তা মরতে এখানে কেন? আর জায়গা নেই?

এই জায়গাই আমার পছন্দ। আজ থেকে রোজ নিশুত রাতে এসে আমি আপনাকে লেখাপড়া শেখাব।

অ্যাঁ! লেখাপড়া! আমাকে!

যে আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে মনে হল, আপনার ভিতরে এক অবিদ্যার বাস, তাকে তাড়াতে হলে বিদ্যের দরকার। আপনি তৈরি থাকুন, কাল থেকেই আমি আপনাকে পড়ানো শুরু করব। প্রথম মুগ্ধবোধ, তারপর বর্ণপরিচয়, তারপর ব্যাকরণ, কথামালা, হিতোপদেশ।

শেখালেই হল! যদি না শিখি!

সহজে শিখবেন না যে আমি জানি, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই।

দেখো মাস্টার, মানে মানে সরে পড়ো, নইলে এমন সব কান্ড করব যে পালানোর পথ পাবে না।

দেখুন না চেষ্টা করে, কত ডাকাত ছেলেকে জল করে এসেছি, আপনি তো কিছুই নন।

আচ্ছা টেঁটিয়া তো!

যে আজ্ঞে।

ও তোমার কম্ম নয় হে। যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন কত মাস্টার কত চেষ্টা করেছে। আমাকে শেখাতে পারেনি। তুমি কোথা থেকে উদয় হলে হে বাপু?

উদয় যখন হয়েই পড়েছি তখন আর সহজে অস্ত যাচ্ছি না, বুঝলেন পটলবাবু?

পটলবাবুর ভূত একটু চুপ করে থেকে বলল, তার মানে তুমি সহজে ঢিট হওয়ার লোক নও।

আজ্ঞে না।

দূর বাপু, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে হবেটা কী? তার চেয়ে যাদের পড়ালে কাজ হয় তাদেরই পড়াও না।

কিন্তু আপনার জন্য যে ইস্কুলটাও উঠে গেছে?

ঠিক আছে বাপু, স্কুল হোক, আমি বরং তখন পাশের গাঁয়ে হাওয়া খেতে যাব।

ঠিক তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মতো বদখত লোকের পাল্লায় পড়লে কি আর কিছু করার থাকে?

মহেন্দ্রবাবু হাসলেন। পাঁচ দিনের মধ্যে শিবেনবাবুর স্কুল চালু হয়ে গেল। স্কুলের হেডমাস্টার হলেন মহেন্দ্রবাবু।